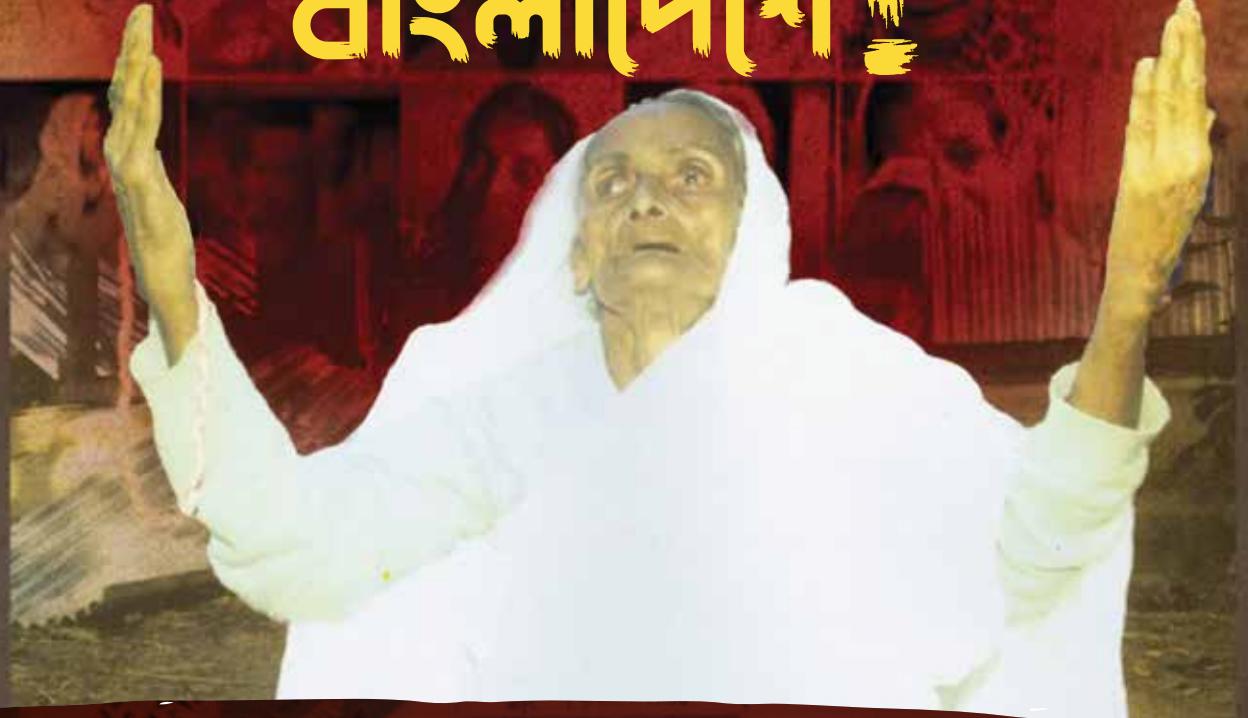


বিএনপি জামাতের ৫ বছরের অপশাসন

২০০১-০৬

কি পটেছিলা বাংলাদেশ?



পথম
এটাই কি তাদের
**TAKE BACK
BANGLADESH?**

ট্রাঙ্গপারেন্সির সূচকে বাংলাদেশ টানা পঞ্চমবার শীর্ষ দুনীতিগ্রস্ত দেশ

দুনীতি যা করে

বিজ্ঞাপন

বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে আরও কম আর্থিক প্রযোগ করে আসছে। এটি আরও অসম্ভব আর এই

বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে আরও কম আর্থিক প্রযোগ করে আসছে। এটি আরও অসম্ভব আর এই

বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে আরও কম আর্থিক প্রযোগ করে আসছে। এটি আরও অসম্ভব আর এই

নির্বাচন

বিএনপির ভোটে জেতার নীলনকশা:
রাতারাতি নির্বাচন কর্মকর্তা হয়ে যায় ৩০০ ছাত্রদল নেতা!



২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারির সাজানো নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জরুরিভাবে উপজেলা নির্বাচনি কর্মকর্তা নিয়োগের নামে ৩০০ দলীয় ক্যাডারদের চাকরি দেয় বিএনপি-জামায়াত সরকার। বাংলাদেশের ইতিহাসে পিএসসি-কে ব্যবহার করে এতো দ্রুত কোনো নিয়োগ ইতিহাসে কখনো হয়নি। কোনো পরীক্ষা ছাড়া সরাসরি তালিকার মাধ্যমে এই নিয়োগ দিয়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং সরকারি চাকরিতে নিয়োগপ্রক্রিয়াকে কলঙ্কিত করে খালেদা জিয়ার সরকার।

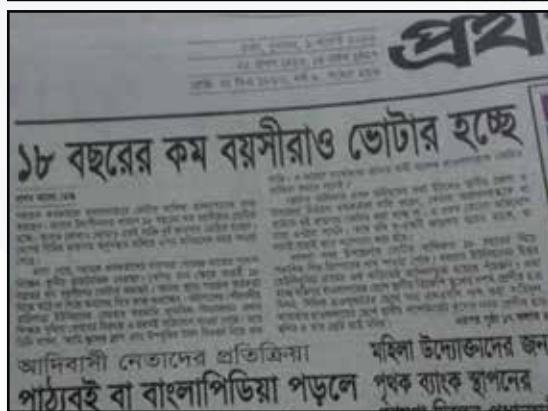
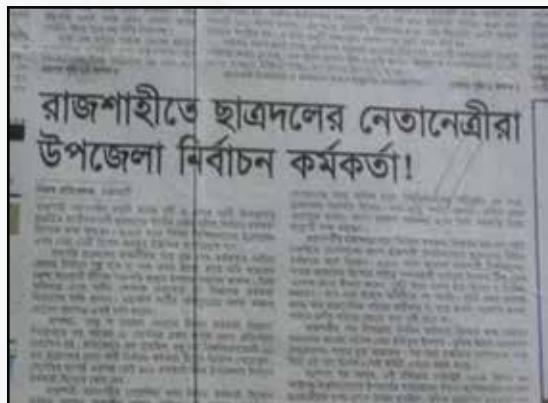
হাওয়াভবন থেকে তারেক রহমানের সরাসরি নির্দেশে, ২০০৬ সালের ৪ সেপ্টেম্বর পিএসসির মাধ্যমে এই নিয়োগবিজ্ঞপ্তি দিয়ে ২৬ ফেব্রুয়ারিতেই নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। তবে ১/১১ এর পটভূমি পরিবর্তনের পর, ১৩ জানুয়ারি ২০০৭ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টারা এবিষয়ে আলোচনা করেন। ২০০৭ সালের ১৮ জানুয়ারির প্রথম আলো পত্রিকায় এই বিষয়ে বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশ হয়।

জানা যায়, নিজেদের মতো করে নির্বাচন আয়োজনের লক্ষ্যে নিয়োগ দিয়েই এই ৩০০ জন ছাত্রদল নেতাকে উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা পদে বসানো হয় এদের। এতে তাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রদলের ৬০ জন নেতাকর্মী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের ১০ জন এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ জন ছাত্রদল নেতাকর্মীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও বগুড়ার ১৫ জন ছাত্রদল নেতাকেও এই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত ছাত্রদল নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক ছাত্রদল নেতা মামিন সরকার, আবদুল গাফফার, মনিরুজ্জামান এবং দণ্ড সম্পাদক সাইয়িদ আহমেদ সাইক্লোন; শহীদুল্লাহ হল ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম রাকিব, সহসভাপতি সাজিউল ইসলাম, যুগ্মসম্পাদক ফজলুল করিম ও সদস্য আবদুর রহিম; জসীমউদ্দীন হল ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি আবদুল হানান ও হাবিবুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ও জাসাস সদস্য সচিব জাহুরুর রহমান, সমাজবিজ্ঞান ও গবেষণা ইনসিটিউট শাখা ছাত্রদলের সহসভাপতি সেকান্দার আলী, জিয়া হল শাখার যুগ্ম সম্পাদক শাহীন আকন্দ, জগ্রুল হক হলের সাবেক সভাপতি নাজিম উদ্দিন ভুইয়া, সুয়েন হলের সাবেক সহসভাপতি শফিকুল ইসলামের নাম উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের বিভিন্ন হল শাখার নেতাকর্মীদের মধ্যে রয়েছে- মেজবাহ উদীন, মনির হোসেন, কাজী মোহাম্মদ নুরে আলম, মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, ওয়াহিদুজ্জামান মুসী তিপু, নজীর আহমদ সীমাব, মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, রশিদ মিয়া সাগর, মনিরুজ্জামান, আবদুল গাফফার, মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান।



খালেদা-তারেকের ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং: ১ কোটি ২৩ লাখ জাল ভোট,
গণপ্রতারণার মাধ্যমে ক্ষমতায় থাকার অপচেষ্টা



২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি সাজানো নির্বাচন করার জন্য ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার তালিকা তৈরি করেছিল বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার। ভোট জালিয়াতির লক্ষ্যে খুব দ্রুততার সাথে ২০০৬ সালে নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে ৩০০ জন ছাত্রদল নেতাকে নিয়োগ দেওয়া হয় তারেক রহমানের তালিকা অনুসারে। এমনকি স্থানীয় পর্যায়েও দলীয় নেতাদের তত্ত্বাবধানে জাল ভোটার তালিকা প্রস্তুত করে খালেদা জিয়ার সরকার। পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ঘাটাই-বাইইয়ের সময় তাদের এই জালিয়াতি ধরা পড়ে এবং ছবিসহ নতুন ভোটার তালিকা তৈরি করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

২০০৬ সালের ৯ আগস্ট প্রথম আলো পত্রিকার সংবাদ থেকে জানা যায়, নতুন ভোটার নথিভুক্ত করার নামে ১৮ বছরের কম বয়সীদের নাম ভোটার তালিকায় তোলা হয় বিএনপি নেতাদের নির্দেশে। এমনকি ১৪ বছরের ক্ষুল পড়ার নাম নথিভুক্ত করা হয় ভোটার হিসেবে। এদের অধিকাংশই বিএনপি-জামায়াত পরিবারের আঢ়ায়া-স্বজন। এর বাইরে, জাল ভোট দেওয়ার জন্য, নিজেদের প্রভাব বলয়ের ভেতরে থাকা ক্ষুলের ছাত্রছাত্রীদের নাম তাদের অজান্তেই ভোটার তালিকায় তোলে খালেদা জিয়ার সরকার। এমনকি বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মী ও তাদের সমর্থকদের নাম একাধিক স্থানের ভোটার হিসেবে পৃথকভাবে নথিভুক্ত রাখা হয়। যা পুরোপুরি সংবিধানবিরোধী।

প্রথম আলোর প্রতিবেদনে উঠে আসে, বরিশালের গৌরনদীতে ১৫০ জন ভুয়া ভোটারের নাম অন্তভুক্ত করা হয়েছিল তালিকায়, যারা সবাই ১৮ বছরের নিচে। তাদের মধ্যে লাখে রাজ কসবা গ্রামের তারাকি উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র ছিল বেশ কয়েকজন। উপজেলার দক্ষিণ গোবর্ধণ এলাকার স্থানীয়রা জানান, যাদের বয়স হয়নি তাদের ভোটার করা হচ্ছে। আবার যারা ভোটার হওয়ার যোগ্য, তাদের ভোটার করা হচ্ছে না।

মংলাতেও নিজেদের ভোট বাড়াতে ক্ষুলপত্তয়াদের ভোটার বানাতে উঠেপড়ে লাগে বিএনপির নেতৃত্বক্ষেত্র। এসব কিশোর-কিশোরীর বাবা-মারাও তাদের সন্তানদের নাম ভোটার তালিকায় ওঠার ব্যাপারে কিছু জানেন না।

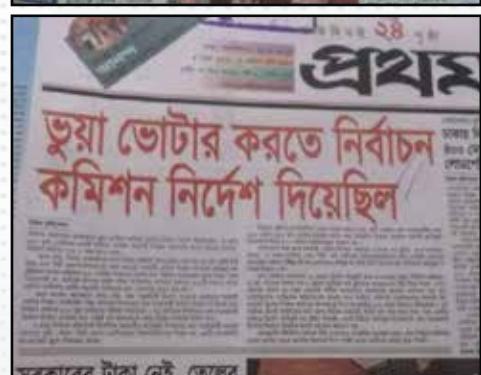
ভোলার আলতাফ রহমান কলেজ, ওবায়দুল হক কলেজ, ইলিশ ইসলামিয়া কলেজ, ফজিলাতুন্নেছা কলেজ, ভোলা সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ভুয়া বয়স দেখিয়ে গণহারে ভোটার বানানো হয়েছে।

আবার বরগুনার ঢালুয়া ইউনিয়ন পরিষদের খাজুরা গ্রামের অনেক ব্যক্তি দুইস্থানে ভোটার হয়েছেন। হারুন মাস্টার পৌর এবং গ্রাম উত্তর স্থানের ভোটার। পৌরতে তার ভোটার নং ৪২৯ এবং গ্রামে ভোটার নং ২৩৭। আবার শামসুদ্দিন শিকদারের পৌর ও গ্রামের ভোটার নং যথাক্রমে ৬৯১ ও ২৪৭, রাসেল শিকদারের ভোটার নং ৯৪১ ও ২০৫, মতিয়ার রহমানের ভোটার নং ৯৪৫ ও ১৮৭, মাহাবুবুর রহমানের ভোটার নং ৯৪৯ ও ১৮৯।

বিএনপি নেতাদের সার্বিক তত্ত্ববধানে ও তাদের পরামর্শ অনুসারে ও তালিকা অনুসারে এসব ভোটার তালিকায় জালিয়াতি ও ভুয়া ভোটার তৈরি করা হয়েছে। এমনকি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা রাজাকার সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীও দুই আসনে ভোটার হয়েছিল। ফটিকছড়ি এবং চট্টগ্রাম-৭ রাঙ্গুনিয়া দুই আসন থেকে ভোট করার জন্য মনোনয়ন তুলেছিল সে। এরপর তার ডাবল ভোটার হওয়ার তথ্য ফাস হয়ে পড়ে। নির্বাচন কমিশনের কর্তৃতারা এই ঘটনাকে প্রতারণা ও বেআইনি বলে অভিহিত করেন।

২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারির প্রথম আলো পত্রিকার সংবাদ জানায়, সাকা চৌধুরীর ভোটার তালিকায় জালিয়াতির ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনাররা বলেন একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ পাঁচটি আসন থেকে নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অংশ নিতে পারেন। কিন্তু তিনি ভোটার হবেন যেকোনো একটি স্থানের। একজন ব্যক্তি দুই জায়গায় ভোটার হতে পারেন না। এটি সাংবিধানিকভাবে অবৈধ। এটি এক ধরণের প্রতারণা।

বিএনপি-জামায়াত নেতাকর্মীরা এভাবেই অনেকে একাধিক স্থানের ভোটার হয়েছেন এবং ভুয়া নাম-পরিচয় দিয়ে প্রায় ১ কোটি ২৩ লাখ ভোটার তালিকা তৈরি করে তারা। কারণ এই ভোটগুলো দলীয় ক্যাডারদের মাধ্যমে কাস্ট করে অবৈধভাবে বিএনপিকে ক্ষমতায় নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাদের।



বিএনপি-জামায়াত সরকারের নির্দেশ ও আর্থিক সাহায্য নিয়ে দেশজুড়ে
সন্ত্রাস চালাতো জঙ্গি সংগঠন জেএমবি

জঙ্গিদের মনদণ্ডাতা বিএনপির ৮ মন্ত্রী-সংসদ
জেএমবির হত্যা-হামলায় মনদণ্ড
রাজশাহী অঞ্চলের তিনি এমপি
বিএনপি-জামায়াত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ
স্থাপনে শরিয়া ছিলেন শারুখ
বিএনপি-জামায়াত সরকারের
নির্দেশ ও আর্থিক সাহায্য নিয়ে
দেশজুড়ে সন্ত্রাস চালাতো জঙ্গি সংগঠন জেএমবি!

২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত সরকার গঠনের পরপরই আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও সমর্থকদের হত্যা, নির্যাতন, চাঁদাবাজি, লুটতরাজ ও ধৰ্ষণ করতে শুরু করে। এমনকি উগ্রবাদী জঙ্গি সংগঠনগুলোকে অর্থ ও তালিকা দিয়ে দেশজুড়ে হত্যায়জ্ঞ চালাতে থাকে তারা। তারেক রহমানের নির্দেশনায় বিএনপির ৮ জন নেতার মাধ্যমে জঙ্গিদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতো খালেদা জিয়ার সরকার। এমনকি মন্ত্রীদের চাপের কারণে পুলিশ বাহিনীর অনেক সদস্য ও বাধ্য হয়েছিল জঙ্গিদের সহযোগিতা করতে। পুলিশের হাত দিয়ে জঙ্গিদের কাছে নিরাপদে অর্থ পাঠাতো বিএনপি সরকারের নেতারা। এমনকি কখনো পুলিশ এই জেএমবি জঙ্গিদের গ্রেফতার করলেও সরকারের চাপে ছেড়ে দিতে বাধ্য হতো, অথবা আদালত থেকে তাদের জামিন দেওয়ার জন্য বিশেষ নির্দেশ আসতো সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে।

২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর এসব তথ্য-প্রমাণ ফাঁস হয়ে পড়ে। ৩০ জানুয়ারি ২০০১ সালের প্রথম আলো পত্রিকায় তথ্য-প্রমাণ-নথিসহ এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ হয়।

২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জেটি ক্ষমতায় যাওয়ার পর থেকেই দেশজুড়ে সাধারণ মানুষ, প্রগতিশীল ব্যক্তি, শিক্ষক, বৃদ্ধিজীবী, নারী কর্মজীবী, আইনজীবী এবং আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের ওপর নির্যাতন ও হত্যায়জ্ঞ চালায় জামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)-র জঙ্গিরা। কিন্তু ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট সারাদেশে বোমা হামলার পর আন্তর্জাতিকভাবে নজরে আসে তারা। এরপর বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জেএমবির এই দুঃসাহস ও অর্ধের উৎস সম্পর্কে গোপন তদন্ত শুরু করে। তদন্তে জেএমবির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উঠে আসে বিএনপির মন্ত্রী-এমপিদের নাম।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তদন্তে উঠে আসে, ১৭ আগস্ট বোমা হামলার পর জেএমবি নেতা সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাইয়ের সাথে মোবাইল ফোনে কথা হয় নাটোরের প্রভাবশালী বিএনপি নেতা ও তৎকালীন উপমন্ত্রী রূহুল কুন্দুস তালুকদার দুলু এবং রাজশাহীর আলোচিত বিএনপি নেতা ও সিটি মেয়র মিজানুর রহমান মিনুর সাথে। বিএনপির হাইকমান্ডের নির্দেশে তারা বাংলা ভাইকে আত্মগোপনের নির্দেশ দেয়।

এমনকি ২০০৪ সালের এপ্রিলে শায়খ আবদুর রহমান এবং বাংলা ভাই ট্রাকে করে প্রায় ১৫০ জন কর্মী নিয়ে প্রকাশ্যে দুলুর নাটোরের বাসভবনে গিয়ে দীর্ঘ বৈঠক করে। এসময় তাদের কাজে খুশি হয়ে দুলু তাৎক্ষণিকবাবে এক বাস্তিল টাকা উপহার দেয় বলেও জানায় বাংলা ভাই।

পরবর্তীতে র্যাব, পুলিশ ও গোয়েন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদে বাংলা ভাই জানায়, সংসদ সদস্য আবু হেনা তার ভাতিজার মাধ্যমে জেএমবির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলতো। জঙ্গি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য মিজানুর রহমান মিনুর সাহায্য চেয়েছিল বাংলা ভাই, এরপর এক কর্মীর মাধ্যমে এককালীন ৫০ হাজার টাকা অনুদান দিয়েছিল মিনু। এমনকি সন্ত্রাসবাদ অব্যাহত রাখার জন্য পুঁঠিয়া থানার ওসি আনিসুর রহমানের হাত দিয়ে বাংলা ভাইয়ের কাছে ৩০ হাজার টাকা অনুদান পাঠিয়েছিল বিএনপির সংসদ সদস্য নাদিম মোস্তফা। গোয়ালকান্দি পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে ওসি নিজে এই টাকা বাংলা ভাইয়ের হাতে তুলে দেয়। এসময় সার্কেল এসপি আলমগির কবির সেখানে উপস্থিত ছিল।

আটকের পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে শায়খ রহমান জানায়, বাগমারায় অভিযানের সময় তৎকালীন টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হকের সাথে যোগাযোগ হয়েছিল। তিনি বিএনপির নেতাদের নির্দেশ দিয়ে জেএমবিকে সাহায্য করতে বলেছিলেন। স্থানীয় বিএনপি নেতারা পরে এই ঘটনার কথা স্বীকার বলে বলেছেন, 'আমিনুল হকের কথার বাইরে যাওয়ার সামর্থ তখন কোরো ছিল না। তাহলে তাদের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার ধ্বংস হয়ে যেতো।'

এমনকি তৎকালীন প্রতিমন্ত্রী নওগাঁর আলমগীর কবিরের সাথেও নিয়মিত কথা হতো এবং তার বাসায় দাওয়াত খাওয়ার কথাও জানিয়েছে বাংলা ভাই। এছাড়াও নওগাঁর এমপি শামসুল আমর প্রমাণিক এবং প্রভাবশালী বিএনপি নেতা ড. ছালেক চৌধুরীর সাথে নিয়মিত মোবাইলে ফোনে যোগাযোগের কথাও স্বীকার করেছে বাংলা ভাই ও শায়খ রহমান। তারা জানায়, বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলে বিভিন্ন হামলার জন্য বিএনপি নেতাদের সহযোগিতার এতো অর্থ উঠেছিল যে, দীর্ঘদিন ধরে অভিযান শেষ করার পরেও সাত লাখ টাকা বেশি হয়েছিল।



১৭ আগস্ট দেশব্যাপী বোমা হামলার পর ময়মনসিংহে আগ্রেগাপনে চলে যায় বাংলা ভাই। সেসময়ও বিএনপির উপমন্ত্রী রংহুল কুন্দুস তালুকদার দুলু, প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবীর, সংসদ সদস্য নাদিম মোস্তফা, সামসুল আলম প্রমাণক, ড. ছালেক চৌধুরী এবং রাজশাহী সিটি মেয়র মিজানুর রহমান মিনুর সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের কথাও স্বীকার করেছে। তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষার জন্য তাদের কাছে সুপারিশ করেছিল বাংলা ভাই। সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপি নেতারা ওপরের মহলে কথা বলে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা এবং পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে আত্মগোপনে থাকার পরামর্শ দেয়। এরপর সবার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়ে চূড়ান্ত আত্মগোপনে চলে যায় বাংলা ভাই।

শায়খ আবদুর রহমান জানায়, বাগমারার নাশকতার পর চরমোনাই পীরের ছেলে মোসাদ্দেক বিল্লার সাথে দেখা করে সে। এরপর তাকে পীরের কাছে নিয়ে যায় মোসাদ্দেক। চরমোনাই পীর এসময় তাদের কার্যকলাপের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করে।

শায়খ স্বীকার করে যে, ২০০৪ সালে ভুয়ায়ন আজাদকে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা করেছিল জেএমবি। এমনকি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহাম্মদ ইউনুসকেও হত্যা করে তারা। তবে ফজলে হোসেন বাদশাকে হত্যার পরিকল্পনা করলেও তা ব্যর্থ হয়। এমনকি অনেক ব্যক্তিকে নিজ হাতে জবাই দিয়ে পুঁতে ফেলার মতো নৃশংস ঘটনার কথাও জানায় শায়খ রহমান।

নওগাঁ, নাটোর ও রাজশাহীর এসপিরা তখন সরকারের নির্দেশে জেএমবির সব কর্মকাণ্ডে সমর্থন দিয়েছে বলেও জানায় শায়খ। তবে এসপিরা এই দাবি অঙ্গীকার বলে বলেন, তারা এর সাথে জড়িত নন। তবে তাদের অধীনে কর্মরত কোনো কোনো থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা (ওসি) এসবের সাথে জড়িত থাকতে পারে।



হারিস চৌধুরী: শূন্য থেকে শত কোটির মালিক; জঙ্গিবাদ ও রাজনৈতিক হত্যায়জ্ঞের মাস্টারমাইন্ড



হারিস চৌধুরী

শূন্য থেকে শত
কোটির মালিক!
জঙ্গিবাদ ও
রাজনৈতিক
হত্যায়জ্ঞের
মাস্টারমাইন্ড!

২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব ছিল হারিস চৌধুরী। এমনকি তারেক রহমানের হাওয়া ভবন সিভিকেটেরও প্রভাবশালী ব্যক্তি সে। ২০০৪ সালে ২১ আগস্ট তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেতৃী শেখ হাসিনাকে গ্রেনেড মেরে হত্যাচেষ্টার প্লট তৈরি করেছে যারা, তাদের অন্যতম একজন। এমনকি সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ কিবরিয়াকে হত্যার পর তার ভাতিজাকেও অপহরণ করেছিল এই ব্যক্তি। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কার্যালয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি সরকারি কাজে মোটা অঙ্কের কমিশন নিতো সে। তাকে টাকা না দিলে কোনো কাজই বের হতো না প্রধানমন্ত্রীর দফতর এবং বেশকিছু মন্ত্রণালয় থেকে।

২০০৭ সালে সেনাসমর্থিত তত্ত্ববিধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর আত্মগোপনে চরে যায় এই শীর্ষ দুর্নীতিবাজ এবং সন্ত্রাসীদের গড়ফাদার। তখন যুগান্তর পত্রিকায় তথ্য-প্রমাণসহ হারিস চৌধুরীর সীমাহীন সন্ত্রাস, দুর্নীতি, লুটপাট এবং অপকর্মের তথ্য প্রকাশ হয়।

সিলেটের স্থানীয়রা জানান, শাহ কিবরিয়াকে হত্যার পর সেই বিচারকে রূঢ় করে দিয়েছিল হারিস চৌধুরী। সিলেটের কানাইঘাটের বাড়ি তার। ২০০১ সালের আগ পর্যন্ত বিজয়নগরের একটি ভাড়া বাসায় থাকতো সে। যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসার জন্য সবার কাছ থেকে অর্থ সহায়তা নিতে হয়েছিল তাকে। তবে ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই বদরে যায় তার ভাগ্য। মাত্র পাঁচ বছরে শত শত কোটি কোটি টাকার মালিক হয় সে। দেশজুড়ে গড়ে তোলে চাঁদাবাজির একচ্ছত্র সাম্রাজ্য।

খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরপরই হারিস চৌধুরী এবং মোসাদ্দেক আলী ফালুকে রাজনৈতিক সচিব নিয়োগ দেন। এরপর তারেক রহমানকে সঙ্গে করে ফালুকে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে সরিয়ে দেয় হারিস। এর পরের দুই বছরের মধ্যেই অস্ট্রেলিয়া ও লঙ্ঘনে একাধিক বাড়ি এবং ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মালিক হয় হারিস। ঢাকার গুলশানে একটি বাড়ি ও পাঁচটি প্লট হয় তার। ব্যবহার করতেন চার কোটি টাকা দামের ইনফিনিটি গাড়ি। তার ভাই সেলিম চৌধুরী শাহজাহানপুরে একটি ছোট স্টিলের আরমারির দোকান চালাতো। হারিসের সৌজন্য সেও হয়ে যায় কোটি কোটি টাকার মালিক। ভাই সেলিম ও স্ত্রীর ছোট ভাই মাসুমও অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ঢাকায় নিজস্ব ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলে, হয় একাধিক বাড়ি ও গাড়ির মালিক।

কিবরিয়া হত্যা:

সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়ার স্ত্রী আসমা কিবরিয়া জানান, কিবরিয়াকে হত্যাকাণ্ডের পর একদিন রাতে হারিস চৌধুরী মরহুম কিবরিয়ার ব্যাংক কর্মকর্তা ভাতজাকে ফোন দেয়। তাকে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে নিয়ে যায়। তখন খালেদা জিয়া তাকে এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে দেশবিদেশের গণমাধ্যমে বক্তব্য না দিতে বলেন। ২০০১ সালে হবিগঞ্জের চার আসনেই আওয়ামী রীগ জয়ী হয়, সেখানে কিবরিয়ার প্রভাব ছিল। একারণে ২০০৫ সালে কিবরিয়াকে হারিস চৌধুরীর পরিকল্পনামতো হত্যা করা হয় বলে পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেন।

পিএসসিতে নামের তালিকা:

সরকারি চাকরির জন্য পিএসসির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নষ্ট করে দিয়েছিল এই হারিস চৌধুরী। পরীক্ষায় দিয়ে ভালো করলেও অনেকের চাকরি হতো না। কারণ, হারিস চৌধুরীর তালিকা অনুসারে চাকরি দিতে বাধ্য করা হতো। এই নিয়োগ বাণিজ্য থেকে কোটি কোটি টাকা আয় করে হারিস চৌধুরী। এমনকি হারিসের হাত ধরে তারেক রহমানও ছাত্রদল নেতাদের তালিকা দিয়ে পরপর তিনটি বিসিএসে নিয়োগকে কলঙ্কিত করেছিল। বগুড়া থেকেই একেকবার ২০-২৫ জন করে এসপি পদে নিয়োগ পাওয়ায় সারা দেশে বিসিএস পরীক্ষাও প্রশ়্নের মুথে পড়ে!

সরকারি ফাইল থেকে দুর্নীতির দরজা:

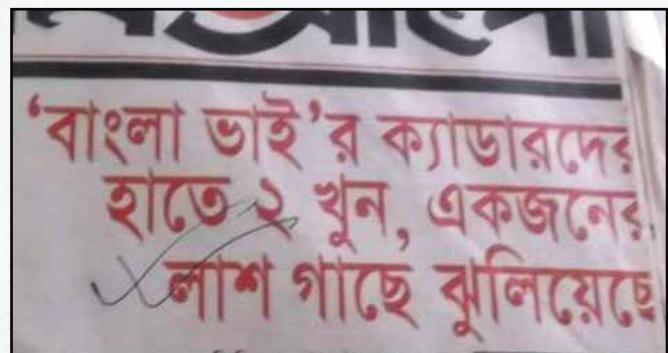
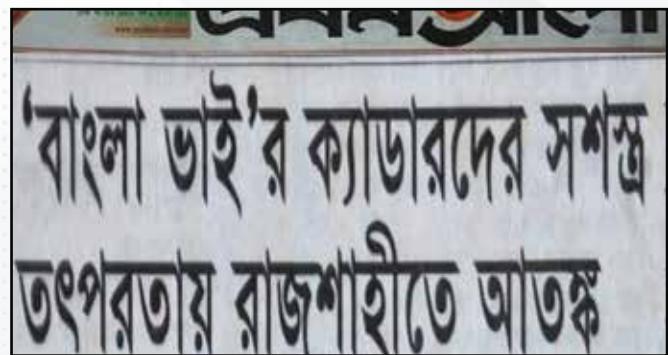
রাষ্ট্রীয় নিয়ম অনুসারে, সরকারি ফাইল দেখার অনুমতি না থাকলেও হারিস চৌধুরী প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সামনেই সব সরকারি গোপন ফাইল পড়ে দেখতো। এবিষয়ে সরকারে সচিব নূরুল ইসলাম বলেন, হারিস চৌধুরীর ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে বলা হলেও তিনি কোনো ব্যবস্থা নিতেন না। ফলে এসব গোপন ফাইল দেখে হাজার হাজার কোটি টাকার সরকারি কাজের আগাম খোঁজ পেতো হারিস। তারপর সেসব কাজের জন্য দেনদরবার করে শত শত কোটি টাকা উপার্জন করে। এসব কিছুই তারেক রহমানের সঙ্গে আলোচনা করে করতো হারিস। হারিসের সব অপকর্মে খালেদা জিয়ারও সম্মতি ছিল।



ঘুষ-চাঁদাবাজি-দুর্নীতি:

হাওয়া ভবনের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হওয়ায় নিয়মিত তারেক রহমানের কাছে সব কাজের বাট্টা পোছে দিত হারিস চৌধুরী। সরকারের চৃত্তিভূতিক নিয়োগ, পদোন্নতি, পোস্টিং প্রভৃতি বাণিজ্য করে কোটি কোটি টাকা আয় করে হারিস। যোগ্যতা না থাকলেও বিদ্যুৎ বোর্ডে নিজের লোককে বিসিয়ে দিয়ে শত কোটি টাকার টেন্ডার লুটপাট করে সে। বন বিভাগকে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করে হারিস চৌধুরী। প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ থেকে এক লাখ করে টাকা দিতে হতো তাকে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাধিরদের জন্য বরাদ্দ কোটি টাকা লোপাট করে সে। শুধু তাই নয়, বিদ্যুৎ সেক্টরে সীমাইন দুর্নীতির জন্য দেশে বিদ্যুৎ সংকট দেখা হয় তখন। এমনকি হারিসের দুর্নীতির দাপটে বিদেশিরাও বিনাসুদে যেসব প্রকল্পে ঝুঁক দিতো, তারাও তা বন্ধ করে দয়, এরমধ্যে পিআরএসসি প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক এবং এডিভির ৫০ মিলিয়ন ডলার অনুদান ফেরত নেওয়ার ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য।

সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা ন্যাশনাল টি গার্ডেনের চেয়ারম্যানের পদ দখল করে, কোটি কোটি টাকা লুটপাট করে এই হারিস। সরকারি জমি দখল, সরকারি বনজ বৃক্ষ বিক্রি, অবৈধভাবে জমি লিজ দেওয়া, ক্রয়-বিক্রয় মূল্যে কারসাজি দেখিয়ে সরকারের চাসেক্টরকেও পঙ্কু করে দেয় সে। এমনকি ২০০৪ সালে শেখ হাসিনার ওপর গ্রেনেড হামলাকারী জঙ্গিদেরও নিয়মিত অর্ত ও পরিকল্পনা দিতো সে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় আদালতে এসব প্রমাণিত হয়।



শেখ হাসিনাকে গ্রেনেড মেরে হত্যাচেষ্টা: বিএনপির তিন মন্ত্রী ও তারেকের নাম জানায় খুনিরা



২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা করে ও গুলি করে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা করেছিল বিএনপি-জামায়াত সরকার। সেই মিশন ব্যর্থ হলেও, আহতদের ঢিকিৎসা প্যান্ট নিতে দেয়নি তারা। এমনকি 'জজমিয়া' নাটক সাজিয়ে এই জঘন্য ঘটনাকে ভিন্নভাবে প্রবাহিত করেছিল খালেদা জিয়ার সরকার। এমনকি শেখ হাসিনাকে রক্ষাকারী আওয়ামী লীগ নেতাদেরই ফাঁসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল বিএনপি সরকার।

কিন্তু ২০০৭ সালে তৎকালীন সরকারের তদন্তে উঠে আসে এই হত্যাচেষ্টার সাথে জড়িত বিএনপির তিন মন্ত্রী, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার পৃত্র তারেক রহমান এবং হাওয়াভবন সিভিকেন্টের নাম। ২০১৭ সালের ৪ নভেম্বরের ভোরের কাগজ প্রকারণ সংবাদে জানা যায়- শীর্ষ জঙ্গ নেতা মুফতি হানান, তার ভাই মহিবুল্লাহ, সহযোগী সাহেবুল আলম বিপুল, মাওলানা আবু সাঈদ এই হামলার তথ্যপ্রমাণ প্রকাশের পর নিজেরাও স্বীকারোভিত দিয়েছে। এসময় তারা তাদের পৃষ্ঠপোষক ও গড়ফণ্ডার হিসেবে বিএনপির তিন মন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর ছেলে তারেক রহমানের সম্পৃক্ততার কথাও জানায়।

শেখ হাসিনাকে হত্যাচেষ্টার সাথে জড়িত বিএনপির তিন মন্ত্রী হলো- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী, প্রতিমন্ত্রী লুৎফুল্লজ্মান বাবর, উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু এবং তার ভাই মাওলানা তাজউদ্দীন। এরা নিয়মিত অর্থ ও তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতো জঙ্গদের। তবে শেখ হাসিনাকে হত্যার মিশন ব্যর্থ হওয়ার পর গ্রেনেড হামলার মাঠ পর্যায়ের তত্ত্বাবধায়ক মাওলানা তাজউদ্দীনকে নিরাপদে পারিস্থানে পাঠিয়ে দেয় তারেক রহমান।

মুফতি হানান আরো জানায়, কোটালিপাড়ায় বোমা পুঁতে শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল। সেই চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায়, পরে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা করে শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। মুফতি হানান নিজে মাঠে থেকে পুরো ঘটনা তদারকি করেছিল। পরে একটি অ্যাম্বুলেন্স করে করে তারা ঘটানস্ত্রল তাগ করে। এমনকি তাদের কিছু হবে না বলেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী আশ্঵াস দিয়েছিল বলেও স্বীকার করে সে।

এই মামলায় পরবর্তীতে লুৎফুল্লজ্মান বাবরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে জানায়, মুফতি হানান তার পরিচিত। হামলার আগে মন্ত্রী পিন্টুর টাঙ্গাইলের বাসা এবং মাওলানা তাজউদ্দীনের বাসায় বৈঠকের কথাও স্বীকার করে সে। এমনকি হাওয়াভবনে তারেক রহমানের সাথে জঙ্গদের একবার একটি বৈঠকের কথাও উঠে এসেছে সবার স্বীকারোভিতে।

দুর্নীতি

২০০১ সালে ক্ষমতায় এসেই গরিবের পেটে লাথি, ভিজিএফ-কার্ড লুটপাট
জামায়াতের



২০০১ সালের অক্টোবরে সরকার গঠনের পরপরই সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতন ও লুটপাটে ব্যস্ত হয়ে পড়ে বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীরা। ২০০২ সালের শুরুতেই পাবনার গরিব ও দুষ্টদের জন্য বরাদ্দ ২ হাজার ১০০ ভিজিএফ-কার্ড জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীদের মধ্যে বিতরণের নির্দেশ দেয় জামায়াতের সংসদ সদস্য মাওলানা আবদুস সোবহান। প্রতিজন দুষ্ট ব্যক্তি এই কার্ডের আওতায় ১০ কেজি করে চাল পাওয়ার কথা। কিন্তু পাবনা পৌরসভার কমিশনারদের পাশ কাটিয়ে এমপি সোবহানের এপিএস সেই চাল এমপির নির্দেশ মোতাবেক দলীয় নেতাকর্মীদের তালিকা অনুসারে বিতরণের নির্দেশ দেয়। এরপর জামায়াতের এমপি সোবহান নিজেও সেই চাল দ্রুত কর্মীদের মধ্যে বিতরণের নির্দেশ দেয়, এমনকি গরিব-দুষ্টদের বাদ দিয়ে জামায়াত-শিবিরের কর্মীদের নামে নতুন করে ভিজিএফ কার্ড তৈরি করার আদেশও দেয় সে।

২০০২ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রথম আলোর প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে আসে।

সংসদ সদস্য সোবহানের নির্দেশ পাওয়ার পর কমিশনারদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেন চেয়ারম্যান। কিন্তু কমিশনাররা জানান, জামায়াত-শিবিরের কর্মীদের তালিকা অনুসারে ভিজিএফ-এর কার্ড ও চাল বিতরণ করার নির্দেশ এসেছে। কিন্তু এই তালিকা দেওয়ার অধিকার সংসদ সদস্যর নাই। এটি করা হবে প্রকৃত গরিব ও দুষ্টরা বঞ্চিত হবে। এর মাধ্যমে শুধু জামায়াত-শিবিরের কর্মীরা লাভবান হবে।

কমিশনাররা জামায়াতের এমপি সোবহানের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায়, কমিশনারদের সঙ্গে ভাগবাটোয়ারার প্রস্তাব দেয় সেই এমপি। গরিব-দুষ্টদের জন্য ৬০০ কার্ড রেখে বাকি ১৫০০ কার্ড জামায়াতের দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে বিতরণের প্রস্তাব দেয় সে। কিন্তু তাতে কমিশনাররা রাজি না হওয়ায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। গরিবদের জন্য ৩১ ডিসেম্বর থেকে পৌরসভায় চাল এসে পড়ে থাকলেও, এমপির হস্তক্ষেপের কারণে তা বিতরণ করতে পারেনি পৌরসভা।

**২০০১-২০০৬ বিদ্যুৎখাতে
বিএনপির লুটপাটের চিত্রঃ
বাঘাবাড়ী বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে ৭০
কোটি টাকা লুটপাট করা হয়েছে**



এক সরকারের আমলে প্রায় সমাপ্ত প্রকল্প পরের সরকার এসে ব্যয় বাড়িয়ে সংশোধন করেছে - উন্নয়নের এমন নজির বাংলাদেশেই সম্ভব! আর এমনটি ঘটেছে বাঘাবাড়ী ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পে। ১৯৯৬-২০০১ সাল পর্বে ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ সরকারের নেওয়া এই প্রকল্পটি হয়েছিল। কিন্তু একই বছরের অক্টোবরে ক্ষমতায় এসে চারদলীয় সরকার প্রকল্পটি টেনে বড় করে। আর এর মাধ্যমে কমপক্ষে ৭০ কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে বলে অভিযোগ করে আইএমইডি।

২০০৭ সালের ২৫ শে জানুয়ারি প্রথম আলো সংবাদে জানা যায়, দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ীতে ১০০ মেগাওয়াট গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কাজ ১৯৯৯ সালে একনেক অনুমোদন করে। ১৯৫ কোটি ৩৭ লাখ টাকা ব্যয়ে দুই বছরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করার কথা ছিল। দ্রুততার সঙ্গেই কাজ এগিয়েছে। ১০০ মেগাওয়াট গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কাজ পেয়েছিল ভারসেল ভ্যাল কোম্পানি। তাদের সঙ্গে ১৩৬ কোটি ৪৪ লাখ ৩২ হাজার টাকার চুক্তি সম্পাদন হয়েছিল ২০০০ সালের ৩ মে। চুক্তি অনুসারে ২০০১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর কাজ শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু বিদ্যুৎকেন্দ্রের সিংহভাগ কাজের শেষ পর্যায়ে সরকার পরিবর্তন হয় এবং জোট সরকার ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে ক্ষমতায় আসে। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরই শুরু হয় প্রকল্পকে ঘিরে লুটপাটের পরিকল্পনা।



২০০২ সালের ২৪ নভেম্বর একনেককে অবহিত করা হয় প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ ১৬০ কোটি টাকায় শেষ হয়েছে। নতুন করে একটি গ্যাস বুষ্টার নির্মাণের জন্য আরও ৩২ কোটি টাকা দরকার। তখন বিদ্যুতকেন্দ্র নির্মাণের সংশোধিত ব্যয় ২৫৬ কোটি ৭০ লাখ টাকা নির্ধারণ করা হয়। একনেক শর্ত সাপেক্ষে ২৫৬ কোটি ৭০ লাখ টাকা অনুমোদন করে। শর্তটি ছিল ১৫ ডিসেম্বর ২০০২ সালের মধ্যে প্রকল্পটির ব্যয়ের খাত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রকৃত খরচের ভিত্তিতে প্রকল্প ব্যয় পুনর্নির্ধারণ করে পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী ২০০২-০৩ অর্থবছরে উন্নয়ন বরাদ্দ দেওয়া হবে। কিন্তু নিদিষ্ট সময়ে ব্যয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শেষ হয়নি। প্রকল্পের অনুক্লে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ ছাড় করা হয় যথেষ্ঠভাবে।

প্রায় দুই বছর সময় নিয়ে পরিকল্পনা কমিশনের বিদ্যুৎ শাখা প্রকল্পটির ব্যয়ের খ্যত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রকৃত খরচের ভিত্তিতে সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় নির্ধারণ করে। তবে সব ধরনের বিধিবিধানকে পাশ কাটিয়ে প্রস্তাবটি পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যের মাধ্যমে না পাঠিয়ে বিদ্যুৎ শাখার উপপ্রধানের মাধ্যমে ২০০৪ সালের ৩০ মার্চ একনেক সভায় উপস্থাপন করা হয়। যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রস্তাবটি না আসায় একনেক সভার আলোচ্যসূচি থেকে তা প্রত্যাহার করা হয় এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবার প্রস্তাবটি পাঠানোর সুপারিশ করা হয়।

তবে সবচেয়ে বেশি অনিয়ম ধরা পড়েছে নির্মাণকাজ ও পরিচালন ব্যয় (ওভারহেড আয়ন্ড এস্টাবলিস্টমেন্ট) খাতে। এ খাতে ২০০২ সালে খরচ সংশোধন করে এক কোটি ৯৩ লাখ টাকা ধরা হলেও প্রকৃত খরচ হিসাবে দেখানো হয়েছে ১১ কোটি ২২ লাখ টাকা। অতিরিক্ত এই নয় কোটি ২৯ লাখ টাকা খরচের কোনো সরকারি অনুমোদন ছিল না।



বিএনপি-জামাতের শাসনামল: হাজার কোটি টাকার কমিশন বাণিজ্য ছিল খালেদাপুত্র কোকোর নিয়ন্ত্রণে



২০০১ সালে ক্ষমতায় দেওয়ার পর হতে ২০০৬ সাল পর্যন্ত দেশের বড় বড় সব সরকারি প্রকল্প ও টেক্নোলজি থেকে নিয়মিত পার্সেন্টেজ নিতো তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকো। চাহিদা অনুসারে পছন্দের কোম্পনিকে প্রকল্প দেওয়ার জন্য মায়ের ওপর চাপ প্রয়োগ করতো জিয়াউর রহমানের ছোট ছেলে। ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর, দুর্নীতির দায়ে আটক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর ও তারেক রহমানের ব্যবসায়িক পার্টনার গিয়াসউদ্দিন আল মামুন এসব ঘটনার কথা স্বীকার করেন।

২০০৭ সালের ৬ সেপ্টেম্বরের দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ সেপ্টেম্বরের প্রথম আলো এবং ১০ সেপ্টেম্বর সমকালের প্রতিবেদনে এসব বিস্তারিত তথ্য উঠে আসে।

বাবর জানায়, বাংলাদেশে ব্যবসা করার সুযোগ দিয়ে ওয়ারিদ টেলিকমের কাছ থেকে ১৫০ কোটি ডলার তথা ১৫ হাজার কোটি টাকা কমিশন নেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে তারেক রহমানের ছোট ভাই আরাফাত রহমান কোকো একাই নেয় ৯০০ কোটি টাকা। বাকি ৫০০ কোটি টাকা তারেক রহমানের কাছে দেওয়া হয় বিএনপির দলীয় তহবিলের জন্য, এবং অবশিষ্ট ১০০ কোটি টাকা নেয় বিএনপির এমপি ও খালেদা জিয়ার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি আলী আসগর লবী।

এছাড়াও টিএন্ডি বোর্ডের একটি খুচরা যন্ত্রাংশের কাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্য চীনের কোম্পানির কাছ থেকে ৩০ লাখ ডলার তথা ৩ হাজার কোটি টাকা কমিশন নেয় খালেদা জিয়ার পুত্র কোকো। এমনি মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের কাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্য জার্মান কোম্পানির কাছ থেকেও মোটা অক্ষের কমিশন নেয় সে। কিন্তু ওই টাকার ভাগ তৎকালীন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের ছেরে সফিউর রহমানকে না দেওয়ায় প্রকল্পটি বাতিল করে দেয় মন্ত্রী।

দেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কোম্পানিকে মন্ত্রণালয়ের কাজ পাইয়ে দেওয়ার অর্ত থেকে, খালেদা জিয়ার একান্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি মোসাদ্দেক আলী ফালুর সাথে একটি সিরামিক ও একটি ডায়াপর কারখানা গড়ে তোলে কোকো। ফালুর প্রতিষ্ঠিত দুটি টিভি চ্যানেলেও কোকোর স্তুর শেয়ার আছে বলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গোয়েন্দা বাহিনীর কাছে স্বীকার করে তারেক রহমানের বন্ধু গিয়াসউদ্দিন আল মামুন।

বাবর তার স্বীকারেভিত্তে জানায়, কোকো ঢাকা শহরের বিলবোর্ড ব্যবসায় একচেটিয়া আধিপাত্য রাখতো। কাজ না দিলে সরকারের অনেক মন্ত্রাদের সাথেও খারাপ ব্যবহার করতো সে। এমনকি ব্যবসা করতে গিয়েও সরকারের কোটি কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি দিয়েছে এই কোকো।

অন্যদিকে, সরকারের মেয়াদ শেষের দিকে চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমোরিং টার্মিনাল বন্দর নির্মাণের জন্য ৩১৭ কোটি টাকার একটি কাজের জন্য চাইনিজ কোম্পানির কাছ থেকে পেতে ১৭ টাকা ঘুষ নেয় কোকো। কিন্তু এরমধ্যেই সরকার বদল হওয়ার টাকা দিয়েও ফেঁসে যায় ওই কোম্পানি। এমনকি চট্টগ্রাম বন্দর এবং ঢাকার কমলাপুর রেলস্টেশনের অভ্যন্তরীণ ডিপোতে মোটা টাকার বিনিয়য়ে গ্যাটকোকে কাজ পাইয়ে দেয় কোকো। এক্ষেত্রে তার সাথে তৎকালীন নৌমন্ত্রী আকবর হোসেনের ছেলে ইসমাইল হোসেন সায়মন। প্রথমে মন্ত্রণালয় থেকে গ্যাটকোকে বাতিল করা হলেও, মা খালেদা জিয়াকে দিয়ে সেই কাজ গ্যাটকোকেই পাইয়ে দেয় কোকো। এজন্য কোকোকে কয়েক ধাপে প্রায় ৫ কোটি টাকা কমিশন দেয় সায়মন। এই দুর্নীতির মামলাতেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় গ্রেফতার হয়েছিল কোকো।

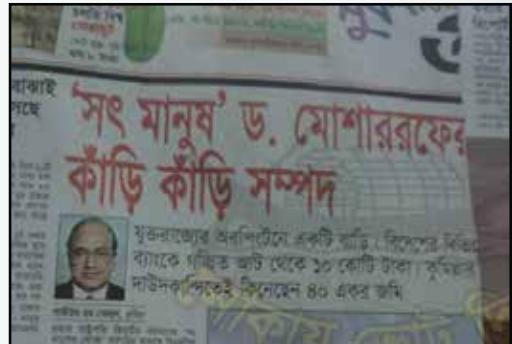
২০০১ থেকে ২০০৬ সাল: খণ্ড দিতে বাধ্য করা হতো ব্যাংককে, হাওয়া ভবন সিঙ্গিকেটের হাজার কোটি লুটপাট



বিএনপি-জামায়াত শাসনামলে খণ্ডের নামে ব্যাংক সেষ্টেরে সুপরিকল্পিত লুটপাট চালানো হয়েছে তারেক রহমানের অফিস হাওয়া-ভবন থেকে। সোনালী ব্যাংকের রমনা ও নারায়ণগঙ্গের শাখা থেকে নিয়মবর্হিতভাবে খণ্ডের নামে লোপাট করা হয় ৪০০ কোটি টাকা। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ভাই সাঈদ এক্সান্ডারের প্রতিষ্ঠান উডল্যান্ড, তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ জসীম উদ্দীনের প্রতিষ্ঠান ফেয়ার ট্রেড, হাওয়া ভবনের লোক হিসেবে পরিচিত আকরাম হোসেনের মাঝ অ্যাসোসিয়েট; জিয়া পরিবারের মালিকানাধীন রহমান ইন্টারন্যাশনাল, রহমান ট্রেডিং প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হাজার কোটি টাকার অর্থ লুটপাট করা হয় ব্যাংক থেকে।

২০০৭ সালের ১ আগস্ট দৈনিক সমকালের প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে আসে। তত্ত্ববধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর, ব্যাংকখাতে দুনীতিবাজারের ধরপাকড় শুরু হয়। তখন ব্যাংকের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বনানীর হাওয়া-ভবন থেকে তালিকা দিয়ে ওই ব্যবসায়ীদের জন্য ব্যক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে এই খণ্ড দিতে বাধ্য করা হয়েছে। এসব খণ্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম-নীতির তোয়াক্ত করা হয়নি। পরে আর ওই খণ্ড শোধ করেনি প্রভাবশালীরা। এই ব্যবসায়ীরা বিএনপির সরকারের হাই-কমান্ডের ঘনিষ্ঠ। তাদের হয়ে ব্যাংকারদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতো ব্যাংকেরই সিবিএ নেতা বাকির হোসেন।

তত্ত্ববধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর, ব্যাংক খাতে হাজার কোটি টাকা খণ্ড লেনদেনে অনিয়ম খুঁজতে তদন্ত কমিটি করা হয়। তখন বাংলাদেশ ব্যাংক ও সোনালী ব্যাংকের তদন্তে এসব চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে। শাখা ব্যবস্থাপকের মৌখিক নির্দেশে এসব খণ্ড ছাড় করতে বাধ্য করা হতো কর্মকর্তাদের। ফলে কাগজে স্বাক্ষর করার কারণে ফেসে গেছেন অনেক কর্মকর্তা।



। সাভারে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব মোসাদ্দেক আলী ফালুর 'সাম্রাজ্য'



বিএনপির শাসনামলের ৫ বছরের মধ্যেই আঙুল ফুলে কলাগাছ বনে যান তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব মোসাদ্দেক আলী ফালু।

খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের প্রভাব খাটিয়ে সাভারের জিরানী হগাহাইল বাড়িতে ফালু গড়ে তোলেন এক বিশাল সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যে বাড়ি, কারখানা, বৃক্ষাশ্রম, বাগানবাড়ি সবই ছিল। এর এই সব জয়ি তিনি দখল করেছিলেন প্রভাব খাটিয়ে।

নামমাত্র মূল্যে এবং জবরদখলের মাধ্যমে এলাকাবাসীর জমি অধিগ্রহণ করে ফালু গড়ে তোলেন ঢাকা-সাংহাই সিরামিক কারখানা, বাবার নামে কলেজ, খালেদা জিয়ার নামে ওল্ডহোম, বাগানবাড়ি ও শ্রমিক পল্লী। কাবিখা ও কাবিটা প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় অর্ধকোটি টাকা ব্যয়ে একটি লেক তৈরি করায় বিরাট এলাকা জলাবদ্ধতার কবলে পড়ে।

এলাকার সরকারি খাসজমি, নিরীহ লোকদের জমি জবরদখল ও নামমাত্র মূল্যে প্রায় ২ শতাধিক বিঘা জমির মালিক হয়ে কোনাপাড়ায় বাবার নামে আবদুল ঢাকা-সাংহাই সিরামিক কারখানা স্থাপন করেন।

২০০৮ সালে দৃষ্টিদের পুনর্বাসনের জন্য বরাদ্দ করা ৭০০ টেক্টিন দিয়ে তার ফ্যাট্টরির জন্য বিশাল শ্রমিকপল্লী নির্মাণ করেন।

বিশালাকার শ্রমিকপল্লী, কাপাসিয়াতে বেগম খালেদা জিয়া ওল্ডহোম, ২ কিলোমিটার লেক, বাগানবাড়ি ও পানিশাইল এলাকায় বিশাল ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন।

খালেদা জিয়ার নামে বৃক্ষাশ্রম নির্মাণ করেছিলেন আষাঢ়টেকের নিবারণ সরকারের বংশধরদের জমি জবরদখল করে।

এছাড়াও সিরামিক কারখানা নির্মাণের কারনে কোনাপাড়া থেকে কলতাসুতি যাওয়ার রাস্তার একপাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় যার কারনে হালকা বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধ হয়ে পড়তেন এলাকাবাসী।

দর্তোগের শিকার এই এলাকার মানুষ এখনো ফালুর কথা স্মরণ করে ঘৃণাভরে। অর্থ-ক্ষমতার দাপটে বিএনপি সরকারের নেতারা সারাদেশেই নৈরাজ্যের বিস্তার ঘটিয়েছিল এভাবেই।

বিএনপি-জামায়াতের দুর্নীতি: বিজ-কালভার্ট নির্মাণের নামে ২০ হাজার কোটি লুটপাট

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় ৫ বছরে বিজ-কালভার্ট নির্মাণের নামে কমপক্ষে ২০ হাজার কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে বলে জানিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন। যথা�সময়ে দুদকের পক্ষ থেকে এসব দুর্নীতি দমনের সুপারিশ করা হলেও তা আমলে নেয়ানি খালেদা জিয়ার সরূপার্ক। ২০০৭ সালের ১৩ নভেম্বর যগাত্তর পত্রিকার প্রতিবেদনে দুদকের বরাতে এসব তথ্য উঠে আসে।

জানা যায়, বিএনপির মন্ত্রী-এমপি ও প্রত্বাবশালী নেতারা নিজেদের স্বজনদের নামে ঠিকাদারি নিয়ে সরকারের হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট করেছে। এরমধ্যে শুধু পাকশী সেতুতেই খরচ করেছে অতিরিক্ত ৫০০ কোটি টাকা। এমনাকি ১৯৯৯ সালে আওয়ামী লীগ আমলে শুরু করা তৈরি সেতুর কাজ শেষ হয় ২০০৩ সালে, এরপর খালেদা জিয়া উদ্বোধন করেন। সেতু নির্মাণের ২ বছর পর ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে অতিরিক্ত ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেন। বিএনপি নেতাদের মাধ্যমে অতিরিক্ত এই টাকা নেয় ঠিকাদার। পরে তা নেতাদের মধ্যে ভাগ হয়।

এছাড়াও শুধু হাস স্লিপে লেনদেনের মাধ্যমে বিজ-কালভার্ট নির্মাণের নামে কমপক্ষে ৫০০ কোটি টাকা লুট করেছে বিএনপি নেতাকর্মী ও তাদের ঘনিষ্ঠ ঠিকাদারেরা। বিএনপির স্বাস্থ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন নিজের এলাকার মৎস্যখামারে যাওয়ার জন্য সরকারের ৪৪ লাখ টাকা ব্যয়ে সেতু নির্মাণ করে, যা জনগণের কোনো কাজেই ব্যবহার হয়নি। ২০০৩ সালে ঢাকায় ৯ কোটি টাকা ব্যয়ে কংক্রিটের ফুটওভার বিজ তৈরির কাজ শুরু করলেও তা পরে বাতিল করার মাধ্যমে, ৯ কোটি টাকা নষ্ট করে বিএনপি-জামায়াত সরকার।

খুলনার বাটিয়াঘাটায় বিজের ৬০ শতাংশ নির্মাণের পর তা স্থগিত করে রাখার ফলে সরকারের প্রায় ৯ কোটি টাকা অপচয় হয়। রায়পুরে আডিয়লখাতে ১৫০ মিটার বিজ নির্মাণের পর তা ভেঙে গেছে। ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলার পাশখালি সেতু নির্মাণের পর ছয় মাস পর তাও ভেঙে যায়। দুর্নীতির কারণে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় এভাবেই কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বিজ-কালভার্টগুলো ধসে গেছে বা ভেঙে গেছে; কোথাও আবার হরিলুটের কারণে ৫০০ কোটি বাজেটের সেতু নির্মাণে ১০০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

বিএনপির মন্ত্রী, এমপি, প্রত্বাবশালী নেতারা ২০০১ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে রাতারাতি শত শত কোটি টাকার মালিক হয়। দেশের অর্থ পাচার করে বিদেশে বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলে। আর দেশ পরপর পাঁচবার দুর্নীতিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়।



২০০১-২০০৬ বিএনপি জামায়াত শাসনামল: ৫ বছরে হাজার কোটির মালিক ফালু, পাচারের টাকা বিনিয়োগ করতে বছরে ১০ বার বিদেশ ভ্রমণ

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব ছিল মোসাদ্দেক আলী ফালু। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে, ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত এই ৫ বছরেই হাজার কোটি টাকার মালিক হয় সে। ঢাকা-গাজীপুর-সাভারেই ১২০ বিঘা জমির দখল করে। এসব জমির বাজারমূল্য ২০০৭ সালে ছিল দেড়শ কোটি টাকা। এছাড়াও লন্ডন ও মালয়েশিয়াতে তেলের ব্যবসায় বিনিয়োগ, সৌদি আরবসহ পাঁচটি দেশে বিশেষ অ্যাকাউন্ট, দেশে ১৫টি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিক হয় ফালু। দুর্নীতি ও লুটের টাকা পাচার করে বিদেশে বিনিয়োগের জন্য ২০০৬ সালে ১০ বার সৌদি আরব যায় সে।

২০০৭ সালের ১ জুন প্রথম আলো পত্রিকার সংবাদে এসব তথ্য জানা যায়। মূলত, ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়া ক্ষমতায় থাকার সময়েও তার একান্ত সচিব ছিল ফালু। কিন্তু ওই মেয়াদে খুব বেশি সম্পদের মালিক হয়নি সে। ২০০১ সালে খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হলে তার রাজনৈতিক সচিব হিসেবে প্রভাব খাটিয়ে হাজার কোটি টাকার পাচার করে ফালু। এসব লুটপাটের টাকা দিয়ে দুটি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং একটি প্রিন্ট মিডিয়া প্রতিষ্ঠা করে গণমাধ্যম-মাফিয়া বনে যায় সে। খালেদা জিয়ার প্রভাব ও গণমাধ্যমের মালিক হওয়ায় বিএনপি-জামায়াত সরকারের আমলে কেউ টু শুট পর্যন্ত করতে পারেনি ফালুর লুটপাট নিয়ে। কিন্তু ২০০৭ সালে জোট সরকারের পতন হলে মুখ খুলতে শুরু করে গণমাধ্যম।

দুর্নীতি দমন কমিশন জানায়- এসবের বাইরেও ফালুর নামে শাহজাহানপুরে একটা সাত তলা ও দুটি পাঁচ তলা বাড়ি, পুরনো ডিওএইচএসে সাড়ে আট কাঠার জমির ওপর ছয় তলা বাড়ি, গুলশানে দুটি প্লটে দেড় বিঘা জমি, তেজকুনী পাড়ায় চারটি প্লটে আড়াই বিঘা, তেজগাঁওয়ে দুটি প্লটে দশ কাঠা, মিরপুরে চার কাঠা এবং মগবাজারে তিনি বিঘা জমি আছে। সাভারে আছে আরো ১০৯ বিঘা জমি। আশিয়ান সিটিতে দশ কাঠা, বসন্ধরার দুটি প্লটে ১৫ কাঠা এবং গাজীপুরে আড়াই বিঘা জমি ও আছে তার।

তদন্তকারীরা আরও জানান, বিদেশে নিজের নামে পাঁচটি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে ফালুর। সৌদি আরবে ২০০৫ সালে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার পর, ২০০৬ সালেই ১০ বার সৌদি ভ্রমণে যায় সে। তার নামে ও বেনামে মোট কতো সম্পদ থাকতে পারে; তা মেলাতে হিমশিম খেতে হয়েছে গোয়েন্দাদের।



২০০১ থেকে ২০০৬: ভূমি দখল ও দুর্নীতিতে মগ্ন ছিল খালেদা জিয়ার মন্ত্রী এবং মেয়রেরা

খালেদা জিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী ও বরিশালের সিটি মেয়র মজিবর রহমান সারোয়ারের দুর্নীতির রেশ পৌছে যায় দেশের সীমা পেরিয়ে বিদেশেও। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত জোট এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পরিবারের সদস্যদের সীমাহীন লুটপাট ও অর্থ পাচারের কারণে পাঁচবার দুর্নীতিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ। ২০০৭ সালে তত্ত্ববধায়ক সরকার আসার পর দুর্নীতিবাজদের ধরপাকড় শুরু হলে, তদের অপকর্মের তথ্যপ্রমাণসহ সংবাদ প্রকাশ করে গণমাধ্যমগুলো।

২০০৭ সালের ৮ জুলাই যুগান্তর পত্রিকার খবরে জানা যায়-
বিএনপি নেতা আলতাফ ও সারোয়ারের
বাড়ি-গাড়ি-মিল-কারখানা এবং অটেল টাকার খোঁজ পেয়েছে
দুর্নীতি দমন কমিশন। কিন্তু এসব অর্থের উৎস খুঁজে পেতে
ইহশিম খেয়েছে তারা। তদন্ত কর্মকর্তারা জানান, ভূমি দখল
করে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছে এই নেতারা।

আলতাফ চৌধুরীর গুলশানে ১০ কাঠা জমির ওপর যে বাড়ি,
সেটার ৫ কাঠা সরকারি জায়গা। সরকারের প্রভাবে ভূমি দখল
করে বাড়ি করেন তিনি। এছাড়াও পটুয়াখালি এবং মির্জাগঞ্জে
তার একাধিক বাড়ি ও জমি রয়েছে। পটুয়াখালীর কাজীপাড়ায়
যে বাড়ি নির্মাণ করেন, তার আগে অন্য একজনের বাড়ির
ভেঙে ফেলেন। এছাড়া ঢাকায় ভাইদের নামে প্লট ও ফ্লাট অর্জন
করেন। মন্ত্রী থাকাকালে জিএসপি লিজিং কোম্পানির ছদ্মবেশে
কয়েক শ' কোটি টাকার মালিক হন তিনি। এমনকি পাকিস্তানে
তার একটি স্পিনিং মিলসহ কয়েকটি দেশে তার আরো ব্যবসা
থাকার অভিযোগ ওঠে। এছাড়াও তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলোতে
কোটি কোটি টাকা সন্ধান পাওয়া যায়।

এদিকে বরিশালের মেয়র মজিবর রহমান সারোয়ারের বাসায়
তল্লাশি চালিয়ে ২৬টি দলিল ও কোটি টাকার বাস্তিল পাওয়া যায়।
দলিলগুলোর বিপরীতে যে জমি ও সম্পদ, তার মূল্য শত
কোটি। এমনকি ৫ বছরে ইসলামি ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংকের
অ্যাকাউন্ট থেকে কোটি কোটি টাকা লেনদেনের প্রমাণ পায়
দুদক। নগরীতে নিজের বসতবাড়ি যেটা নির্মাণ করেছেন
মেয়র, সেটাও অর্পিত সম্পত্তির ওপর। অবৈধভাবে ভূমি দখল
করে বাড়ি নির্মাণ করে এই বিএনপির এই নেতা। ঢাকার
সিদেশ্বরী ও গুলশানে ফ্লাট এবং বনানী ও উত্তরায় প্লটের সন্ধান
পাওয়া গেছে। এর বাইরে ঢাকার দুটি ব্যাংকে তার বিপুল
অক্ষের অর্থ রয়েছে, যেগুলোর কোনো বৈধ উৎস নাই।

বিএনপি-জামায়াতের শাসনামলে এভাবেই তাদের মন্ত্রী থেকে
নেতা-কর্মীরা সবাই লুটপাট করে সর্বস্বান্ত করে বাংলাদেশকে।



খালেদা জিয়ার শাসনামল: বনের কাঠ চোরাচালানের কোটি টাকার বাট্টা পৌছে যেত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং হাওয়া ভবনে



তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ২০০৭ সালের ৯ জুলাই দৈনিক সংবাদ, ১ জুনের ইন্ডেফাক, ২২ জুলাই যুগান্তর এবং ১২ মার্চ যুগান্তর পত্রিকায় এসব তথ্য প্রকাশ হয়।

২০০৬ সালের শুরুর দিকে লক্ষ্মীপুরের সাবেক বিভাগীয় বন রক্ষক শামছুল হক এবং তৎকালীন প্রধান বন রক্ষক ওসমান গণির মাধ্যমে কোটি টাকার সরকারি গাছ কেটে ভাগ করে নেয় বিএনপি নেতারা। দরপত্র দাখিলের আগেই খুব নিম্ন দামে এই ভাগবাটোয়ারা করে তারা। এমনকি পরবর্তীতে দলীয় লোক ছাড়া অন্য কাউকে দরপত্র পর্যন্ত ফেলতে দিতো না তারা।

বন অফিস সত্রে জানা যায়- সদর, রামগঞ্জ, রায়গতি, রায়পুর উপজেলায় ২০৪ লটে ২৫ হাজারের বেশি পুরনো গাছ বিক্রি করা হয়েছে। রামগঞ্জে বিএনপি নেতা ও প্রতিমন্ত্রী জিয়াউল হক জিয়ার সেভেন স্টার বাহিনীর সহায়তায় প্রায় ৫ কোটি টাকার সাড়ে তিন হাজার পুরনো গাছ মাত্র ২৬ লাখ ৩২ হাজার টাকায় বিক্রি দেখানো হয়েছে। রায়পুরের বিএনপি নেতা এবং সংসদ সদস্য আবুল খায়ের ভুইয়ার নেতৃত্বে বিএনপির দুর্বলতা এক কোটি টাকার ৬২৩টি পুরনো গাছ মাত্র ৭২ হাজার টাকায় কিনে নিয়ে যায়।

লক্ষ্মীপুরে ৪৭ লটে আড়াই হাজার গাছ এবং সোনাপুর সড়ক এলাকায় ১৬ লটে দেড় হাজারের বেশি গাছ, যার বাজার মূল্য ৫ কোটি টাকার ওপরে। কিন্তু বিএনপি নেতা শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানিল লোকজন প্রভাব খাটিয়ে মাত্র ২৮ লাখ টাকায় এই গাছ কিনে নেয়। এভাবেই কোটি কোটি টাকার সরকারি সম্পদ লুট করে নিয়ে যায় বিএনপি নেতারা। এদের অনেকে হাওয়া ভবনের ঘনিষ্ঠ আবার অনেকের হাই-কানেকশন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পর্যন্ত। এই লুটপাটের কারণে সরকার কোটি কোটি টাকা রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে।



২০০৭ সালে, তত্ত্বপ্রায়ক সরকারের সময় ঘোথ বাহিনীর অভিযানে আটক হয় বন প্রধান ওসমান গণি। জানা যায়, প্রধান বন রক্ষক হওয়ার জন্য বিএনপি-জাময়াত সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কার্যালয়ের কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তাকে ২০ কোটি টাকা উৎকোচ দিয়েছিলেন তিনি। এবং বিএনপি নেতাদের কাছে শত কোটি টাকার সরকারি কাঠ সুলভমূল্যে সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রবর্তীতে বিএনপির শীর্ষ মন্ত্রী-গণি ও নেতারা অবৈধ পথে গণির মাধ্যমে শত শত কোটি টাকার সরকারি বন উজাড় করে।



বনের রাজা ওসমান গণির আগের মেয়াদে বন প্রধান ছিলেন মুসী আনোয়ার। তিনিও নিয়মিত মাসোহারা দিতেন বিএনপি নেতাদের। ঘোথ বাহিনীর কাছে দেওয়া তার স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়- দুই বনমন্ত্রী তরিকুল ইসলাম এবং শাজাহান সিরাজের বাসায় গিয়ে প্রতিমাসে ক্যাশ ৬ লাখ টাকা করে ঘৃষ্ণ দিতে হতো। এছাড়াও বন বিভাগ সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান নাজিমুদ্দিন আলমকে ১ লাখ করে টাকা দেওয়া হতো।



২০০৮ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত সময়ের প্রধান বন সংরক্ষক মুসী আনোয়ারল ইসলাম আরও জানায়, বিএনপি-জাময়াত সরকারের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব হারিস চৌধুরীকেও প্রতি মাসে ৬ লাখ টাকা করে ঘৃষ্ণ দিতে সে। মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বনানীতে একটি গাড়িতে টাকার ব্যাগ তুলে দেওয়া হতো, পরে হারিস চৌধুরী ফোন দিয়ে টাকা পাওয়ার তথ্য নিশ্চিত করত।



মুসী আনোয়ারল আরো জানায়, বন বিভাগের প্রধান হওয়ার পর বনমন্ত্রী শাজাহান সিরাজের ছেলে তার কাছে ৫০ রাখ টাকা ঢাঁদা দাবি করে। এই টাকা গিয়াসউদ্দিন আল মামুনের নির্দেশে তারেক রহমানের কাছে পাঠাতে হবে। এরপর সেই টাকা সংগ্রহ করে হাওয়া ভবনে পাঠিয়েছিলেন বলেও জানান এই সাবেক বন প্রধান।



জিয়া পরিবারের কমিশন বাণিজ্য: পাঁচ বছরে বিমানের আড়াই হাজার কোটি টাকা লুটপাট



২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সরকারে থাকার সময় দেশজুড়ে সরকারি প্রতিষ্ঠান, সরকারি প্রকল্প এবং সরকারি বরাদ্দে হরিলুট চালিয়েছে বিএনপি-জামায়াত নেতারা। বিশেষ করে বিএনপি চেয়ারপারসন ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পরিবারের সদস্যরা কমিশন বাণিজ্যের মাধ্যমে অবৈধভাবে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হয়। বাংলাদেশ বিমানের মতো একটি প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতির মাধ্যমে চুম্ব খেয়ে নিঃস্ব করে দিয়েছিল খালেদা জিয়ার ছেট ভাই ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার শামীম ইক্সান্ডার ও জিয়া পরিবারের আত্মীয় তৎকালীন বিমান প্রতিমন্ত্রী মীর নাসির। ক্ষমতা ছাড়ার চার মাস আগেও বিমানের ১০০ কোটি টাকার কাজ বাগিয়ে নেয় তারা।

২০০৭ সালের ৯ মার্চ প্রথম আলো পত্রিকার প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে আসে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় আইনশৃঙ্খলা বাহনীর তদন্তে জানা যায়, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) জ্বালানি বাবদ বিমানের কাছে দেড় হাজার কোটি টাকা পাবে। এছাড়াও দেশে-বিদেশে বিমানের দেনা আরো প্রায় এক হাজার কোটি টাকা। জোট সরকারের পাঁচ বছরে বিমান যখন এই আড়াই হাজার কোটি টাকার লোকসানে পড়ে, ঠিক সেই সময়েই বেসরকারি বিমান সংস্থা জিএমজি নিজেদের ব্যবসার বিপুল লাভ ও প্রসার অজন করেছে।

বিমানের কর্মকর্তারা বলেন, খালেদা জিয়ার ভাই ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার শামীম ইক্সান্ডার এবং প্রতিমন্ত্রী মীর নাসির পাঁচ বছরে বিমানকে ধ্বংস করে দিয়েছে। মীর নাসির কয়েকশ কোটি এবং শামীম ইক্সান্ডার ও তার শ্যালক কমপক্ষে আড়াইশ কোটি টাকার কমিশন বাণিজ্য করেছে। দুর্নীতির দায় থেকে বাঁচার জন্য সরকারের শেষের দিকে চাকরি ছেড়ে দেয় শামীম। মূলত- বিমানের লিজ, বিমানের যন্ত্রাংশ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত, প্রভৃতি কাজের জন্য নিজের শ্যালক শাহেদুল হককে দিয়ে কাঞ্জে প্রতিষ্ঠান খোলায় শামীম। এরপর বিদেশি কোম্পানির দেশীয় এজেন্ট হিসেবে সেগুলোর মাধ্যমে কাজ পাইয়ে দেয় বিদেশি কোম্পানিগুলোকে। এরমাধ্যমে মোটা অংকের কমিশন আদায় করতো তারা। এছাড়াও শামীম ইক্সান্ডার প্রভাব খাটিয়ে বিদেশ থেকে চারটি বিমান ভাড়া করে যাত্রী সেবার জন্য। পাঁচ বছরে বিমানগুলোর পেছনে খরচ হ্য ২৫০ কোটি টাকা। অর্থ ওই টাঁকা দিয়ে ছয়টি বিমান কেনাই যেতো। এমনকি দ্বিগুণ দামে দুটি ডিসি-১০ ভাড়া নিয়ে পাঁচ বছরে ১০০ কোটি টাকা শুধু মেরামত বাবদই খরচ করা হয়েছে। ৪০ লাখ ডলারে এই বিমান দুটি কিনতেই পাওয়া যেতো, অর্থ পাঁচ বছরে ১ কোটি ২০ লাখ ডলার ভাড়া পরিশোধ করা হয় এগুলোর জন্য। ঠিক এভাবেই আমেরিকার একটি এয়ারবাসের ক্ষেত্রেও এরূপ দুর্নীতি করে শামীম।

চট্টগ্রামের মেয়র নির্বাচনের সময় মীর নাসিরকে জিয়া পরিবারের একজন বলে অভিহিত করেছিল তারেক রহমান। বিমানের কেনাকাটা, নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি থেকে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতি করে এই নাসির। এছাড়াও ক্রয়, লিজ ও পুরনো বিমান বিক্রির নামেও টাকার পাহাড় গড়ে তোলে সে।

বিমানকে বাঁচাতে জোট সরকার কোনো উদ্যোগ না নেওয়ায় একপর্যায়ে বিমানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিজেরাই সম্প্রতি সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে এবং দুর্নীতিবাজদের বিচার দাবি করে। কিন্তু সরকার সেদিকে কর্ণপাত করেনি। পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর এসব অনিময়, দুর্নীতি এবং কমিশন বাণিজ্যে হরিলুটের তথ্য জনসম্মুখে আসে।

বিএনপি-জামায়াত শাসনামল: খালেদা জিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠতার জেরে হাজার কোটির মালিক, ভূভি ও অর্থ পাচারের অন্যতম হোতা মোসাদ্দেক আলী ফালু



খালেদা জিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠতার জেরে হাজার কোটির মালিক, ভূভি ও অর্থ পাচারের অন্যতম হোতা মোসাদ্দেক আলী ফালু!

মোসাদ্দেক আলী ফালু- বাংলাদেশের এক মহা-বিতর্কিত চরিত্র। খালেদা জিয়া ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত সরকারের সময় অবৈধভাবে হাজার কোটি টাকার মালিক হয় সে। ভূভির মাধ্যমে বিপুল অর্থ পাচার করে বিদেশের মাটিতেও গড়ে তোলে একাধিক ব্যবসা। কৌশলে ভূমি ও জলাশয় দখল, ঠিকাদারদের কাছ থেকে কাজের পারসেন্টেজ এবং সরকারি সম্পদ লুটপাট করে মিডিয়া সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল সে। খালেদা জিয়ার কারণে ফালুর নামে মুখ খোলার সাহস পেতো না কেউ। কিন্তু দৃশ্যপট বদলে যায় ২০০৭ সালে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রকাশিত হতে থাকে একের পর এক প্রতিবেদন। ফালুর সম্পদের পরিমাণ দেখে অবাক হয়ে যায় তদন্তকারীরাও।

২০০৭ সালের ১ জুন তারিখের প্রথম আলো পত্রিকার সংবাদ থেকে জানা যায়, জোট সরকারের শেষের দিকে দুর্নীতি ও লুটের টাকা পাচার এবং বিদেশে নিরাপদ বিনিয়োগের জন্য ২০০৬ সালে ১০ বার সৌদি আরব যায় সে। এছাড়াও লভন ও মালয়েশিয়াতে তেলের ব্যবসায় বিনিয়োগ, সৌদি আরবসহ পাঁচটি দেশে বিশেষ অ্যাকাউন্ট, এমনকি দেশের মধ্যে ফালুর ১৫টি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি পায় আইনশঙ্গলা বাহিনী। মূলত, ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব ও এমপি থাকার সময় অবৈধভাবে অগাধ টাকা, শত শত বিঘা জমি, অজস্র বাড়ি ও ব্যবসার মালিক হয় সে।

এমনকি নামে-বেনামে ভূভির মাধ্যমে ফালুর শত শত কোটি টাকা পাচারের বিষয়ে আলোচনা পর্যন্ত হয়েছে ব্রিটেনের পার্লামেন্টে। কারণ বাংলাদেশে খালেদা সরকারের পতন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযান শুরু হলে, ব্রিটেনের একটি মানি এক্সচেঞ্জ কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যায়। যা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয় ব্রিটিশ সমাজেও।

২০০৭ সালের ২০ জুলাই দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকা থেকে জানা যায়, ২০০৬ সালের শেষের দিকে ব্রিটেনের ফাস্ট সলিউশন মানি ট্রাস্ফার লিমিটেড নামের একটি মানি এক্সচেঞ্জ কোম্পানি দেউলিয়া ঘোষণা করে নিজেকে। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিএনপি নেতা মোসাদ্দেক আলী ফালু অর্থ পাচার করতো কিনা তা পার্লামেন্টে জানতে চান ব্রিটিশ এমপিরা। এমনকি ব্রিটেন থেকে পরিচালিত ফালুর 'চানেল এস' এর কার্যক্রমের বিষয়েও ক্ষেত্র প্রকাশ করেন তারা।

ব্রিটিশ এমপি জর্জ গ্যালওয়ে পার্লামেন্টে জানান, বাংলাদেশে সরকার পতনের পর দেউলিয়া ঘোষণা করা ব্রিটিশ মানি এক্সচেঞ্জ কোম্পানিটির বিরুদ্ধে আগেও অনেক অভিযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের কারণে ফাস্ট সলিউশনের অবৈধ অর্থের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়,

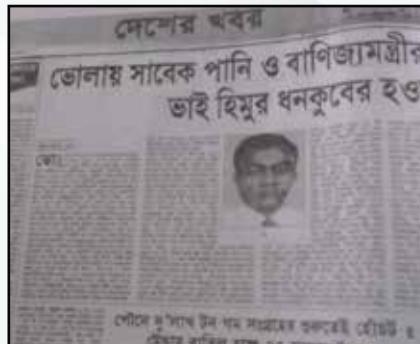
এবং এরফলে প্রতিষ্ঠানটি দেউলিয়া হয়ে যায়- এরকম কিছু ঘটেছে কিনা তা তদন্ত করার আহ্বান জানান তিনি।

২০০৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর দৈনিক সংবাদ পত্রিকা জানায়, ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার দেশজুড়ে যে হরিলট এবং অর্থপাচায় চালিয়েছে, সেজন্যই পরপর ৫ বার দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তথ্যমত্তে- ওই পাঁচ বছরে অবৈধ সম্পদ অর্জনের তালিকায় শীর্ষে থাকা তারেক রহমান ও তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু গিয়াস উদ্দিন আল মামুনের পরপরই শীর্ষে রয়েছে ফালুর নাম।

দুর্নীতি দমন করিশন আরও জানায়- এসবের বাইরেও ফালু ও তার পরিবাদের সদস্যদের নামে শাহজাহানপুরে একটা সাত তলা ও দুটি পাঁচ তলা বাড়ি, পুরনো ডিওএইচএসে সাড়ে আট কাঠার জমির ওপর ছয় তলা বাড়ি, গুলশানে দুটি প্ল্টে দেড় বিঘা জমি, তেজকুনী পাড়ায় চারটি প্ল্টে আড়াই বিঘা, তেজগাঁওয়ে দুটি প্ল্টে দশ কাঠা, মিরপুরে চার কাঠা এবং মগবাজারে তিন বিঘা জমি আছে। সাভারে আছে আরো ১০৯ বিঘা জমি। আশিয়ান সিটিতে দশ কাঠা, বসন্ধরার দুটি প্ল্টে ১৫ কাঠা এবং গাজীপুরে আড়াই বিঘা জমির সম্মৌখীন পাওয়া যায়।

এমনকি নিজের নামে বিদেশে পাঁচটি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে ফালুর। ২০০৫ সালে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার পর, ২০০৬ সালেই ১০ বার সৌদি আরব ভ্রমণে যায় সে। তার নামে ও বেনামে মোট কতো সম্পদ থাকতে পারে; তা মেলাতে হিমশিম খেতে হয়েছে গোয়েন্দাদের।

এরপরও কারসাজি করে সরকারি জমি দখল করেছে এই ধনাত্য ব্যক্তি। গণপৃষ্ঠ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা মূল্যের সরকারি প্লট অনিয়ম করে পানির দামে কিনে নিয়েছে সে। এমনকি সরকারি জলাশয় দখল থেকেও পিছিয়ে ছিল না ফালুর লোকজন। বিএনপি-জামায়াত সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে দেশজুড়ে নদী ও জলাশয় দখলের মহোৎসব চালায় নেতারা। ঢাকার বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদী ভরাট করে শত শত কোটি টাকার মালিক হয় বিএনপি নেতা নাসিরদীন পিন্টু, সালাউদ্দীন আহমেদ, গিয়াসউদ্দীন সেলিমরা। রাজধানীর বাইরে এই জবর-দখল অব্যাহত রাখে বিএনপি চেয়ারপারসন ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব এবং প্রভাবশালী বিএনপি নেতা মোসাদ্দেক আলী ফালু গং।



২০০৭ সালের ৩ এপ্রিল দৈনিক সমকালে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, ফেনী শহরের ঢাকা-চট্টগ্রাম ট্রাঙ্ক রোডের পশ্চিমাংশে ৫০ শতকের একটি সরকারি জলাশয় দখল করে ফালুর ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী এনামুল হক চৌধুরী সেলিম। আগে ফেনীতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতি হলেও, বিএনপি-জামায়াত আমলে মোসাদ্দেক আলী ফালু সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে তার। এরপর ফালুর সহায়তায় অগ্রণী কঙ্টাকশন এবং নবারুণ বিল্ডার্স নামে দুটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং কিছু মন্ত্রণালয় থেকে কোটি কোটি টাকা লোপাট করে সে।

ফালুর প্রভাবে রাতারাতি ঢাকা ও ফেনী শহরে শত কোটি টাকার মালিক বনে যাওয়া সেলিম ২০০৩ সালের ৩১ মার্চ অবৈধভাবে সরকারি জলাশয়টি নিজের নামে কিনে নেয়। ভূমি অপিল বোর্ড এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দিলেও ফালুদের নির্দেশে তা পাশ কাটিয়ে যায় তৎকালীন জেলা প্রশাসক মোস্তফা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ক্ষমতার জোরে ২০ লাখ টাকা শতকের জমি মাত্র ৬০ হাজার শতক হিসেবে কিনে নেয় সেলিম। এরপর তা ভরাট করে টিনের লম্বা ঘর তুলে দোকান এলাকা হিসেবে ভাড়া দিয়ে দেয়। প্রশাসন ও আদালত শত চেষ্টা করেও তখন সেই জমিতে চুক্তে পারেনি।

এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে কাজ পাইয়ে দেওয়া, ব্যবসার সুযোগ করে দেওয়া এবং ঠিকাদারি কাজের কমিশন থেকেও কোটি কোটি টাকা অবৈধভাবে আয় করেছে মোসাদ্দেক আলী ফালু। তাদের দুর্নীতি, লুটপাট এবং অর্থ পাচারের কারণে ভেঙে পড়েছিল দেশের অর্থনীতি। রেমিটেন্স হয়ে পড়েছিল প্রায় শূন্য। সন্ত্রাস ও দারিদ্র্য নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল দেশের মানুষ।



খালেদা জিয়ার দুঃশাসন: পিএসসির বোর্ডে সব বিএনপি-জামায়াতের লোক, মোটা অর্থের বিনিময়ে বিসিএসে নিয়োগ!



খালেদা জিয়ার দুঃশাসন

পিএসসির বোর্ডে
সব বিএনপি
জামায়াতের লোক,
মোটা অর্থের
বিনিময়ে বিসিএসে
নিয়োগ!

২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত সরকার গঠনের পরপরই সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে দলীয়করণ শুরু করে। এমনকি পিএসসি-এর মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকেও দুর্নীতির আঁখড়ায় পরিণত করে তারা। নগদ টাকার বিনিময়ে বিসিএস-এর প্রশঞ্চকাঁস ও পরীক্ষার খাতা জালিয়াতির মাধ্যমে নিয়োগ বাণিজ্য এবং দলীয় কর্মীদের অসৎ উপায়ে চাকরিতে নিয়োগ দিতে শুরু করে। ফলে মেধাবী শিক্ষার্থীরা বাধিত হয় ন্যায্য চাকরি থেকে। ২৪-তম বিসিএসের প্রশংসন ফাঁসের ঘটনায় দেশজুড়ে সমালোচনার বাড় ওঠে। সীমাইন দুর্নীতির কারণে ২৭-তম বিসিএস পরীক্ষার ভাইভার রেজাল্টও বাতিল ঘোষণা করতে বাধ্য হয় তত্ত্ববিধায়ক সরকার।

২০০৭ সালের ২৭ জানুয়ারি সমকালের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে নথিপত্রসহ এসব দুর্নীতির চিত্র উঠে আসে। জানা যায়, পিএসসির চেয়ারম্যানসহ ১০ সদস্যকে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ দেয় খালেদা জিয়ার সরকার। এরপর তাদের মাধ্যমে নিয়োগবাণিজ্য এবং দলীয়করণ শুরু করে তারেক রহমানের হাতোয়া ভবন চক্র। ২৫তম বিসিএস-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত পিএসসির সদস্য অধ্যাপক মাহফুজুর রহমানের আপন ভাই প্রশাসন ক্যাডারের মামুনুর রশিদ চাকরিপ্রার্থীদের সাথে পিএসসি সদস্যদের 'কন্ট্রাক্টম্যান' হিসেবে কাজ করতো। মামুন নিজে জোট সরকারের প্রতিমন্ত্রী লুৎফুর রহমান খান আজাদের এপিএস হিসেবে পাট ও বন্দু মন্ত্রণালয় এবং এনজিও ব্যুরোতে কাজ করেছে। তার মাধ্যমেই বিএনপির হাই কমান্ড বিসিএসে পুলিশ ও প্রশাসনে নিজেদের লোক নিয়োগ করতো।

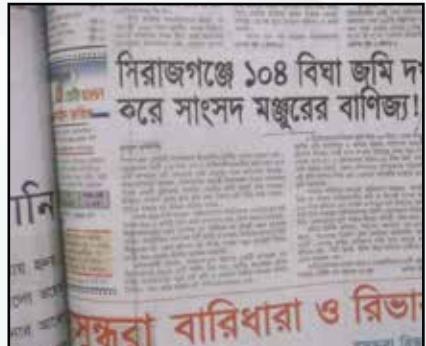
টাকার হিসাব বন্টনের জন্য তাই মামুন একটি ডায়ারি ব্যবহার করতেন। কোন প্রার্থীর কাছ থেকে কতো নিতেন এবং পিএসসির কোন সদস্যকে কতো দিতেন, কোন প্রার্থীর জন্য কোন নেতার সুপারিশ সেটার সব তথ্য লেখা থাকতো সেখানে। তার বড় ভাই পিএসসি সদস্য অধ্যাপক মাহফুজুর রহমান সাংবিধানিক এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকা অবস্থাতেই নীলফামারীর একটি আসনে বিএনপির হয়ে গণসংযোগ করতেন এবং নবম জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিতে চেয়েছিলেন। পিএসসি চেয়ারম্যান জেডএন তাহমিদা বেগম ও প্রভাবশালী সদস্য মাহফুজ পর্দার অন্তরালে থেকে কাজ করতেন। সামনে থাকতো মামুন।

সমকালের অনুসন্ধানে মামুনুর রশিদের সেই ডায়রি পাওয়া যায়। সেখানে প্রাথীদের নাম, মোবাইল নম্বর, ক্যাডারের নাম, পাশে টাকার হিসাব লেখা। সেই তালিকা ধরে ফোন দেওয়ার পর প্রাথীর পরিবার জানায়- তারা চাকরি পেয়েছেন এবং ট্রেনিংয়ে আছেন। তবে একজন চাকরি পালনি এমন তথ্যও জানা যায়। তবে তাকে ২৭ তম বিসিএসে সেই ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়া হয়। এসব তথ্যপ্রমাণসহ পিএসসি চেয়ারম্যান জেডএন তাহিমিদা বেগমের সাথে কথা বলতে চাইলে তিনি ফোনে কথা বলতে অস্বীকার করেন। প্রসঙ্গত, এই পিএসসির চেয়ারম্যানের সাথে যোগসাজশ করে বিএনপিপস্থী চিকিৎসকদের সংগঠন ড্যা-এর মহাসচিব ডা. জাহিদ অবৈধভাবে কয়েকশ চিকিৎসকের নিয়োগ ও পদায়ন করেছিল, যা নিয়ে বাংলাদেশের চিকিৎসাঙ্গনে সমালোচনার বাড় উঠেছিল সেসময়। কিন্তু এরা হাওয়া ভবনের ঘনিষ্ঠ লোক হওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি এদের বিরুদ্ধে।

এদিকে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান পরিচয় শোনার পর ভাইভা বোর্ড থেকে প্রাথীকে বের করে দিতেন আরেক পিএসসি সদস্য সাবেক যুগ্ম সচিব মোজাম্বেল হক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চারটি প্রথম শ্রেণি পাওয়া ইয়াসমিন সুলতানাকে ২৭তম বিসিএসের ভাইভা বোর্ড থেকে বের করে দেন তিনি। ইয়াসমিন জানান, তার বাবা মুক্তিযোদ্ধা এই কথা শোনার পরেই তাকে বের করে দেওয়া হয়। এবিষয়ে জানতে চাইলে অভিযুক্ত মোজাম্বেল হক বলেন, 'আমি যোগ্যতায় বিশ্বাসী। তবে পিএসসিতে চরম দুর্নীতিবাজ একটি চক্র রয়েছে। ওদের বিরুদ্ধে লেখেন না কেন?' সেই দুর্নীতিবাজদের নাম জানতে চাইলে তিনি আরো বলেন, 'তারা অনেক প্রভাবশালী। নাম বললে আমাকে গুলি করে মেরে ফেলবে তারা।'

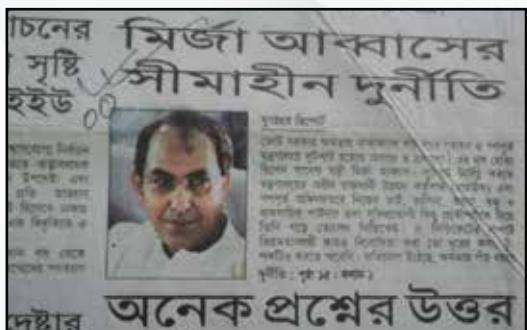
২৭ তম বিসিএস বোর্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত আরেক সদস্য আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী ব্যাপক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তিনি পিএসসির একজন সহকারী পরিচালক ও নিজের পিও এর মাধ্যমে লেনদেন করতেন বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপকভাবে তথ্য ছড়িয়ে পড়ে। তার রেফারেন্স দিয়ে ব্রাঞ্ছনবাড়িয়ার এক প্রাথী আগে থেকেই এসপি হবে বলে এলাকায় বলে বেড়াতো, এবং সে হয়েছে। জনশ্রুতি আছে ২১ লাখ টাকা লেনদেন হয়েছে এই নিয়োগে।

২৫ ও ২৭ তম বিসিএস পরীক্ষার মাঝাখানে ২৬তম বিসিএস ছিল শুধু শিক্ষা ক্যাডার। সেটির অধিকাংশ নিয়োগে গড়ে পাঁচ



লাখ টাকা করে লেনদেন এবং বিএনপি-জামায়াত দলীয় ব্যক্তিদের স্বজনদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় মার্কশিট বদল করে নাস্বার বাড়িয়ে দেওয়া এবং ভাইভায় বেশি নাস্বার দেওয়ার মাধ্যমে এই দুর্নীতি করা হতো। এছাড়া তারেক রহমানের তালিকা ধরে শুধু বগুড়া ও আজিজুল হক কলেজ ছাত্রদল নেতাকর্মীদের মধ্য থেকে ২৫ জনের অধিক ব্যক্তিতে পুলিশ ক্যাডারে নিয়োগ দেওয়ার মতো জ্ঞান্য ও নিন্দনীয় ঘটনাও ঘটিয়েছে বিএনপি-জামায়াত আমলের পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি)। দেশে এরকম ন্যাকারজনক ঘটনা এর আগে বা পরে আর কখনোই ঘটেনি।

এমনকি পিএসসির মাধ্যমে রাতারাতি ৩০০ ছাত্রদল নেতাকে উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিয়ে ভোট জালিয়াতি করার নীল নকশা ও করেছিল খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান। তবে পরবর্তীকারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাদের এই অপ্রয়াস নষ্ট হয়। এছাড়াও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনার দাবির মুখে বিএনপি-জামায়াতের তৈরি করা ভোটার তালিকা যাচাই করে ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার শনাক্ত করে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার।



২০০১ থেকে ২০০৬: স্পিকারের চেয়ারে বসে পাঁচ শতাধিক নিয়োগ বাণিজ্য করেন জমিরউদ্দিন সরকার

২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত সরকারের আমলে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া প্রত্যক্ষভাবে তার দুই ছেলে তারেক ও কোকোকে হাজার হাজার কোটি টাকা দুর্নীতিতে সহায়তা করেন। এমনকি তার ভাঞ্চেরাও সরকারের কোটি কোটি টাকা লুটপাট করে। একই সঙ্গে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে থাকা বিএনপির নেতা, মন্ত্রী-এমপিরাও হরিলুট শুরু করে। এমনকি জাতীয় সংসদ সচিবালয়েই পাঁচ শতাধিক নিয়োগ বাণিজ্য করেন খালেদা জিয়ার স্পিকার জমিরউদ্দিন সরকার। জমিরউদ্দিনের এসব দর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে তারেক রহমান সংসদ সচিবালয় থেকে গাড়ির তেল পর্যন্ত কিনে নিতেন অবৈধভাবে।

২০০৭ সালের ২৭ জানুয়ারি দৈনিক সমকালের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, কোনো নিয়মের তোয়অক্তা না করে জাতীয় সংসদে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগে রেকর্ড করেছেন স্পিকার জমিরউদ্দিন সরকার। এই নিয়োগের সংখ্যা পাঁচশ ছাড়িয়ে গেছে। এমনকি সরকারের শেষের দিকে (২০০৬ সাল) সংসদ কার্যকর না থাকলেও দেড়শ কর্মচারী নিয়োগ দেন তিনি। প্রতি নিয়োগে পাঁচ লাখ টাকা করে গেনেদেন হয় তার অফিসের সহকারী ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তার মাধ্যমে।

এমনকি মাস্টাররোল থেকে চাকরি স্থায়ীকরণের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের নির্দেশনায় বলা ছিল, ১৯৯৪ সালের আগে থেকে যারা চাকরি করছে তাদের স্থায়ী করতে হবে। তবে আদালতের সেই আদেশকে অমান্য করে ১০১ জনকে স্থায়ীভাবে চাকরিতে নিয়োগ দেন জমিরউদ্দিন। এমনকি সরকারের মেয়াদ শেষেও ১৯৪ জনকে তৃতীয়, চতুর্থ, ড্রাইভার, মালি, ব্যক্তিগত সহকারী প্রভৃতি পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। এমনকি নিজ দলীয় ডেপুটি স্পিকারকে পাশ কাটিয়েই এসব নিয়োগ দেওয়ায় দম্প্ত দেখা দেয়। পরে খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা রাজাকার সালাউদ্দিন চৌধুরী বিষয়টি মীমাংসা করে দেয়।

এসব নিয়োগে খোদ স্পিকারের বিরুদ্ধে মোট দশ কোটি টাকার ওপরে নিয়োগ বাণিজ্য, দলীয়করণ এবং স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ওঠে। এব্যাপারে ডেপুটি স্পিকার আখতার হামিদ সিন্দীকি বলেন, এসব নিয়োগে তিনি জড়িত নন। কীভাবে এতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, তাও তিনি জানেন না। এমনকি এসব নিয়োগ নিয়ে তৎকালীন রাজনৈতিক দলগুলো সংসদে আলোচনা করতে চাইলেও, স্পিকারের তাদের সেই সুযোগ দেননি বলেও অভিযোগ করেন বিরোধী দলীয় নেতারা।

সাবেক স্পিকাররা এ বিষয়ে বলেন, জমিরউদ্দিন সরকার স্পিকারের পদকে কলঙ্কিত করেছেন। দলীয় বিবেচনায় এবং নিয়োগ বাণিজ্যের জন্য প্রতিবছর ধাপে ধাপে তিনি পাঁচ শতাধিক নিয়োগ সম্পন্ন করেন। সংসদের জন্য এটি একটি ন্যাকারজনক ঘটনা।



খালেদা জিয়ার দুঃশাসন:
৫০০ টাকায় ১০০ একর
সরকারি জমি নিয়েছিল
অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের
চেলে কায়সার!



২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় থাকাকালে মৌলভীবাজার ও সিলেটজুড়ে নিজস্ব সন্তানী বাহিনী গঠন করেছিল বিএনপি নেতা সাইফুর রহমানের পুত্র নাসের রহমান। রিমাণ্ডের নামে সাধারণ মানুষকে ধরে নিয়ে নির্মম নির্যাতন চালাতো তার ক্যাডার বাহিনী। নাসেরের রিমাণ্ডের কথা মনে করলে বিরোধী দল তো বটেই, তার নিজ দলের অনেক মানুষও শিউরে ওঠেন এখনো। অন্যদিকে তারেক রহমানের সরাসরি আশীর্বাদে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের অন্য দুই পুত্র কায়সার রহমান এবং শফিউর রহমানও সরকারি ভূমি দখলের প্রতিযোগিতায় নেয়েছিল। তাদের দখল ও দুর্নীতির কারণে হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে ক্ষতির শিকার হয়েছে তখন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষেত্রে আসার পর ২০০৭ সালের ১৯ জুলাই প্রথম আলো সাইফুর রহমানের দুই পুত্রের ২০০ একর সরকারি জমি এবং বনাঞ্চল দখলের বিষয়ে বিস্তারিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। জানা যায়, হাওয়া ভবন সিভিকেটের আরেক বিএনপি নেতা এবং তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ ভূমি উপমন্ত্রী রঞ্জল কুন্দুস তালুকদার দুলুর সহায়তায় কয়েকশ শত কোটি টাকা মূল্যের ভূমি ও বনাঞ্চল কৌশলে দখল করেছিল শফিউর রহমান ও কায়সার রহমান। বিএনপি-জামায়াতের শাসনামলে এই রঞ্জল কুন্দুস তালুকদার দুলুর তত্ত্বাবধানেই উত্তরাঞ্চলে চাঁদাবাজি ও খুনখারাপি শুরু করেছিল বাংলাভাই সহ উগ্রবাদী জঙ্গিরা।

ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়, সরকারি বনাঞ্চলের কোনো জমি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ দেওয়া নিষিদ্ধ। সেখানে বনাঞ্চলের ১০০ বিঘা জমি মাত্র ৫০০ টাকায় বরাদ্দ নেন কায়সার রহমান। কিন্তু ভূমি উপমন্ত্রী দুলুর কারণে সরকারি কর্মকর্তারা এ বিষয়ে কোনো কথা বলার সাহস পাননি। এছাড়াও শফিউর রহমানও আরো ১০০ বিঘা জমি বরাদ্দ নেয়।

জানা যায়, ২০০১ সালের অক্টোবরে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার গঠনের পরপরই ২০০২ সালের ৯ মার্চ ৫৭৪ এর জায়গা বরাদ্দ পাওয়ার জন্য আবেদন করেন সাইফুর রহমানের দুই পুত্র শফিউর ও কায়সার। এর প্রেক্ষিতেই ২০০২ সালের ডিসেম্বরে শফিউর রহমানকে ১০০ একর এবং ২০০৩ সালের এপ্রিলে কায়সার রহমানকে আরো ১০০ একর জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়। ১০০ একর জমির দান নির্ধারণ করা হয় ৫০০ টাকা। মাইজিদিহিটি ও নারায়ণছড়া মৌজার এসব সরকারি বনাঞ্চলের ভূমির একটা ছোট অংশে ৫০ বছর ধরে কিছু পরিবার বাস করছিল। জমি দখল নেওয়ার জন্য পুলিশ দিয়ে তাদের উচ্চেদ করার চেষ্টা করেন কায়সার। কিন্তু স্থানীয় নারী-পুরুষদের ঝাড়ু-দা-বতি প্রতিরোধে ব্যর্থ হন তিনি।

বরাদ্দ নেওয়া এসব জমিতে কয়েকটি সরকারি প্রতিষ্ঠান, তিনটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, ১০টির অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এসব জায়গায় সহস্রাধিক মানুষের বসতবাড়ি, এতেগুলো প্রতিষ্ঠান এবং বনাঞ্চল থাকার পরেও কীভাবে তা একজন মানুষকে বরাদ্দ দেওয়া হরো- তা বোধগম্য নয়। তবে সরকারি কর্মকর্তারা জানান, আবেদনপত্রে এসব তথ্য গোপন রেখে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিলেন সাইফুর রহমানের দুই পুত্র। এমনকি ভূমি উপমন্ত্রী দুলুর কারণে তা যাচাই করার সাহস হয়নি কারো। তারেক রহমানের সাথে সাইফুর রহমানের আরেক পুত্র নাসের রহমানের কমিশন বাণিজ্য পার্টনারশিপ এবং অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায়, তাদের বিষয়ে কথা বলার মতো সাহস তখন কারোরই ছিল না।

২০০১ থেকে ২০০৬: সমুদ্র সৈকতের ১০০ একর জমি দখল করে খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ বিএনপি নেতারা



বিএনপি-জামায়াত শাসনামলে খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে তার ঘনিষ্ঠদের পানির দামে প্লট দিয়ে সরকারের হাজার কোটি টাকা লুটপাট করেন। এমনকি তার আত্মীয়-স্বজন এবং কাছের বিএনপি নেতাদের চাহিদামতো কক্ষবাজার সমুদ্র সৈকতের পাশে ১০০ একর সরকারি জমি দখল করার ব্যবস্থা ও করে দেন তিনি। প্লট বরাদ্দের নামে শত একরের এই জায়গা ভাগ বাটোয়ারা করে নেয় খালেদা জিয়ার ও তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা।

সৈকতের জমি দখলকারী ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম হলো- খালেদা জিয়ার ভাই ও বিএনপি নেতা সাঈদ এক্সান্দার, তারেক রহমানের আত্মীয় সালাহ উদ্দিন আহমেদ, বিমান মন্ত্রী মীর নাসির, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোরশেদ খানের ছেলে ফয়সাল খান; তারেক রহমানের বন্ধু মামুনের ভাই এমপি হাফিজ ইব্রাহিম, ইকোনো বলপেনের মালিক এমপি কাজী সালিমুল হক, বাবুল গাজী, আশরাফ হোসেন, হাবীবুন নবী খান সোহেল প্রমুখ প্রতাবশালী বিএনপি নেতারা।

২০০৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রথম আলোর প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, হোটেল মোটেল তৈরির নামে ১০০টি প্লট করার কথা বলে সমুদ্রসৈকতের ১০০ একর জমি দখল করে সৈকতের পরিবেশ নষ্ট করে এই বিএনপি নেতারা। বরাদ্দ নেওয়ার পর অবৈধভাবে অধিকাংশই চড়া দামে এসব জমি বিক্রি করে দিয়ে কোটি কোটি টাকার মালিক হন। খালেদা জিয়ার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও তৎকালীন যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী সালাহ উদ্দিন আহমেদ, তারেক রহমানের সহযোগিতায় এবং ভূমি উপমন্ত্রী রঞ্জল কুন্দুম তালুকদার দুলুর সহায়তায়, ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে সমুদ্রের পরিবেশ সংকটাপন এলাকায় অবৈধভাবে এসব জমি বরাদ্দের বন্দোবস্ত করেন।

স্থানীয় বিএনপি নেতারা জানান, তাদের অনেকের নামেই প্লট বরাদ্দ নিয়েছিলেন সাবেক মন্ত্রী সালাহ উদ্দিন আহমেদ। কিন্তু তারা শুধু স্বাক্ষর করা ছাড়া আর কিছুই করেননি। হাওয়া ভবনের কথা বলে এসব প্লট তাদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়ে প্রতি প্লট তিন থেকে চার কোটি করে বিক্রি করেছেন সালাহ উদ্দিন। এমনকি তাদের কোনো টাকা পয়সাও দেওয়া হয়নি।

ব্যবসায়ীরা জানান, সমুদ্র ঘেঁষা ১০০ একর জমিতে ১০০টি প্লট দখল করে তারা ওখানে বিএনপি পল্লী গড়ে তুলেছে। সরকার যদি ন্যায্যভাবে এসব অবৈধ প্লট পুণরায় ন্যায্যভাবে বরাদ্দ দেয়, তাহলে সরকার হাজার কোটি টাকা রাজস্ব পেতে পারে।

প্রসঙ্গত, এই সালাহ উদ্দিন আহমেদ তারেক রহমানের এতোটাই ঘনিষ্ঠ যে- ঢাকা শহরকে যখন চারভাগে ভাগ করে শীর্ষ সন্তাসীদের এলাকা নির্ধারণ করে দিয়েছিল তারেক, তখন যে ঢারজন বিএনপি নেতাকে চার অঞ্চল দেখাশোনার দায়িত্ব দেন সে, তাদের অন্যতম একজন হলো সালাহ উদ্দিন। ফলে শীর্ষ সন্তাসীদের সহায়তায় ঢাকায় বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদীর বিস্তীর্ণ

এলাকা দখল ও ভরাট করে স্থাপনা নির্মাণের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা অবৈধভাবে আয় করে সালাহ উদিন। এছাড়াও ভূমিউপমন্ত্রী রঞ্জল কুন্দুস তালুকদার দুলুর মাধ্যমে নাটোর-পাবনা-রাজশাহীসহ উত্তরাঞ্চলে বাংলাভাই এবং উগ্রবাদী জঙ্গিদের প্রষ্ঠপোষকতা করতো তারেক। সরাসরি সরকারের মদত থাকায় বাংলা ভাইয়ের মতো খনি জঙ্গিদের সাথে প্রাকশ্যে নিজ বাসভবনে বৈঠক এবং তাদের মধ্যে অর্থ বিতরণ করতেন এই বিএনপি নেতা দুলু।



ଆଗେର ଟିନ ଓ ଲୁଟପାଟ

২০০১ থেকে ২০০৬: অসহায়দের জন্য বরাদ্দ টিন এবং ওএমএস-এর চাল লুটপাট করতো বিএনপি-জামায়াত নেতারা



২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত সরকারে থাকার সময় দেশের গরিব ও দুষ্টদের জন্য বরাদ্দ টিন চুরি করে বাজারে বিক্রি করে দিতো অথবা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিতো বিএনপি-জামায়াত নেতারা। এমনকি অসহায় মানুষদের জন্য সরকারের অনুদানে দেওয়া ওএমএস-এর চাল পর্যন্ত নিজেদের দলীয় কর্মীদের মধ্যে তালিকা করে বিতরণ করতো তারা।

২০০৭ সালের ১৪ মার্চ ও ২১ ১৯ মার্চ দৈনিক যুগান্তরের প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে আসে। এমনকি ২০০১ সালে নির্বাচনে জেতার পরপরই, ২০০২ সালে পাবনায় জামায়াতের এমপি দুষ্টদের পরিবর্তে জামায়াত-শিবির কর্মীদের তালিকা দিয়ে তাদের কাছে ওএমএস-এর চাল দেওয়ার জন্য চাপ দেন উপজেলা চেয়ারম্যানকে। এটি নিয়ে চেয়ারম্যান ও এমপির মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় চাল আটকে থাকে গুদামে।

এমনকি জোট সরকারের পতনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়, ২০০৭ সালে সিলেটের প্রভাবশালী বিএনপি-জামায়াত নেতাদের পুকুর থেকেও শত শত বাস্তিল আগের টিন উদ্ধার করে পুলিশ। জানা যায়, শুধু কুড়িগ্রাম থেকেই পৌনে তিন হাজার বাস্তিল আগের টিন উদ্ধার করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এমপিদের মাধ্যমে এই টিন দুষ্ঠদের জন্য বিতরণের কথা থাকলেও, তা বিতরণ না করে নিজেরা ব্যবহার করে বিএনপি-জামায়াত নেতাকর্মীরা।

ଆଗ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ଆସାଦୁଲ ହାବିବ ଦୁଲୁର ଉଲିପୁରେ ଶୁଣିର ବାଡ଼ିର ସ୍ଵଜନଦେର ମଧ୍ୟେ ଦେଓୟା ହ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ବାଣିଲ ଟିନ୍ । ୪୩ ଜନେର ନାମେ ଏହି ଟିନ ବରାଦ ନେଓୟା ହଲେଓ ସେଇ ତାଳିକାଟି ଛିଲ ଭୂଯା । କୁଡ଼ିଗ୍ରାମ ପୌରସଭାର କମାତ୍ର ୬ ଜନକେ ୧୨ ବାଣିଲ ଟିନ ଦେଓୟାର ପର ବାକି ଟିନଗୁଲୋ ଲୋପାଟ କରେ ଦେଓୟା ହ୍ୟ ।

এছাড়াও দিনাজপুরের বিরল উপজেলার শতগ্রাম ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবদুর রশিদকে ত্রাণের টিন আগ্রামাতের ঘটনায় আটক করা হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়। স্বীকারোত্তি অনুযায়ী তার বাড়ি থেকে টিন উদ্ধার করে পুলিশ। নান্দাইল উপজেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক কামরূজ্জামান রাসেলের বাড়ি থেকেও ত্রাণের টিন উদ্ধার করা হয়। বরগুনা ও বরিশালেও পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিপল পরিমাণ ত্রাণের টিন উদ্ধার করে।

ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ଆଓୟାମୀ ଲୀଗେର ନେତା କମ୍ମିଦେର ଉପର ବର୍ବରତା

| ବିଏନପି ଜାମାୟାତେର ବର୍ବରତା: ୨୦୦୧ ସାଲେ କ୍ଷମତାୟ ଏସେଇ ହାତ, ପା କେଟେ
ନେଯ ଶତାଧିକ ଆଓୟାମୀ ଲୀଗ ନେତାକମ୍ମିର



୨୦୦୧ ସାଲେର ୧ ଅକ୍ଟୋବର ନିର୍ବାଚନେ ଜେତାର ପରପରଇ ଦେଶଜୁଡ଼େ ଆଓୟାମୀ ଲୀଗ ନେତାକମ୍ମି-ସମର୍ଥକ, ପ୍ରେଶାଜୀବୀ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ଶୁଶୀଳ ସମାଜ ଓ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କର ଓପର ହାମଲେ ପଡ଼େ କ୍ୟାଡାର ବାହିନୀ । ବିଏନପି-ଜାମାୟାତେର ସନ୍ତ୍ରାସୀଦେର ହାମଲାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ମାସର ମଧ୍ୟେଇ ଖୂନ ହନ ଶତାଧିକ ଆଓୟାମୀ ଲୀଗ ନେତାକମ୍ମି । ଏମନକି ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସଞ୍ଚାହେର ମଧ୍ୟେଇ ତାଦେର ହାମଲାୟ ହାତ-ପା ହାରିଯେ ପଞ୍ଚ ହରେ ଯାଓୟା ମାନୁଷେର ଆହାଜାରିତେ ଭାରୀ ହରେ ଓଠେ ଢାକାର ବିଶେଷାୟିତ ହାସପାତାଲଗୁଲୋ । ଆଓୟାମୀ ଲୀଗ ସମର୍ଥକଙ୍କର ଜବାଇ ଦିଯେ ଲାଶ ଫେଲେ ରାଖେ ଯେଥାନେ ସେଥାନେ । ତାଦେର ଗୁଲି ଓ ବୋମାବାଜିତେ ହୁବିର ହରେ ପଡ଼େ ପୁରୋ ଦେଶ ।

ନିର୍ବାଚନେ ଦୁଇ ସଞ୍ଚାହ ପର ଏ ବିଷୟେ ଢାକାର ବଡ଼ ହାସପାତାଲଗୁଲୋ ସୁରେ ଏକଟି ସଂକଷିପ୍ତ ପ୍ରତିବେଦନ ପ୍ରକାଶ କରେ ଦୈନିକ ସଂବାଦ ପତ୍ରିକା । ସେଥାନେ ବଲା ହୁଏ, ନିର୍ବାଚନେ ପର ବିଏନପି-ଜାମାୟାତେର ସହିଂସତାର ଶିକାର ହରେ ଆଶ୍ଚର୍ମା, ହାତ-ପା ହାରିଯେ ହାସପାତାଲଗୁଲୋତେ ଭର୍ତ୍ତି ହରେଛନ ଅଜନ୍ତ୍ର ମାନୁଷ । ନତୁନ କରେ ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି କରାର ମତୋ ଜାଯଗା ନେଇ ଆର । ୧୬ ଅକ୍ଟୋବର (୨୦୦୧) ଏର ଦୈନିକ ସଂବାଦ ପତ୍ରିକାର ଏକଟି ସରେଜମିନ ଅନୁସନ୍ଧାନୀ ପ୍ରତିବେଦନେ ଏରକମ କିଛି ଘଟନା ତଥ୍ୟସହ ତୁଳେ ଧରା ହରେଛେ ।

ଢାକା ମେଡିକ୍ୟାଲେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ନରନ୍‌ସିଂଦୀର ବେଳାବୋ ଥାନାର ଆଓୟାମୀ ଲୀଗ କମ୍ମି ନୁରଳ ଆମିନକେ ୭ ଅକ୍ଟୋବର ବିଏନପିର ସନ୍ତ୍ରାସୀରୀ ମାଥାଯ ଲାଠି ଦିଯେ ମାରେ । ତାରପର ଥେକେ ଏକ ସଞ୍ଚାହ ପରେଓ ଜ୍ଞାନ ଫେରେନି ତାର । ଆଓୟାମୀ ଲୀଗେ ଭୋଟ ଦେଓୟାର କାରଣେ ରଂପୁରେର ପୀରଗଞ୍ଜେର ପ୍ରାଣ ଗୋପାଳକେଓ ଏଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତରା ପିଟିଯେ ମେରେ ଫେଲାର ଚେଷ୍ଟା କରେ ।

ବଞ୍ଚବଞ୍ଚ ମେଡିକ୍ୟାଲେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଡାକ୍ତାର ବିଜୟ ଦନ୍ତ, ପଟ୍ଟୁଯାଖାଲିର ଆଲୀ ଆକବର ଓ ସନ୍ଦିପେର ଫୋରକାନ ଉଦ୍ଦିନଓ ମୃତ୍ୟୁର ସଙ୍ଗେ ପାଞ୍ଜା ଲଡ଼ିଛିଲେଣ । ୪ ଅକ୍ଟୋବର ବିଏନପିପଞ୍ଚା ଚିକିତ୍ସକରା ଢାକା ମେଡିକ୍ୟାଲ ଥେକେ ଅପହରଣ କରେ ନିଯେ ଗିଯେ ହତ୍ୟାର ଚେଷ୍ଟା କରେ ଡ. ବିଜୟକେ । ପରେ ତାକେ ମାରାତ୍ମକ ଆହତ ଅବସ୍ଥାଯ ଉଦ୍ଧାର କରେ ଢାକା ମେଡିକ୍ୟାଲେର ନିଉରୋଲଜି ବିଭାଗେ ଭର୍ତ୍ତି କରା ହୁଏ । ବିଏନପିର ଡାକ୍ତାରଙ୍କା ସେଥାନେ ଆବାରୋ ହାମଲା ଚାଲାଯ ତାର ଓପର । ଏରପର ବଞ୍ଚବଞ୍ଚ ମେଡିକ୍ୟାଲେ ପାଠାନୋ ହୁଏ ତାକେ ।

বিএনপি-জামায়াতের হামলায় বঙ্গবন্ধু মেডিক্যালে হাত-পা ভাঙা অবস্থায় আরও পাওয়া যায় আওয়ামী লীগ কর্মী শরীয়তপুরের সিরাজ, স্বরূপকাঠির চুনু, মাদারীপুরের শিবচরের মোশাররফ, শৈল কুপার বোরহানউদ্দীন, ঘাটা-ইলের আরিফ, গফরগাঁওয়ের কামরঞ্জামান, ঢাকা মহানগর ৩০ নং ওয়ার্ডের সহসভাপতি আবদুল বাসিত, সিলেটের মীর বাজারের তামিম, সুজানগর সাতবাড়িয়ার ইউপি চেয়ারম্যান শামসুল আলম, হবিগঞ্জের চুনারঞ্চাট উপজেলার হাবিবুর রহমান জিতু, নেয়াখালির বেগমগঞ্জের প্রফুল্ল কুমার দেবনাথ ও টঙ্গির শান্তিকে। বিএনপি-জামায়াতের কোগে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ হারিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিলেন তারা।

ঢাকা মহানগর ৩০ নং ওয়ার্ডের সহসভাপতি আবদুল বাসিত জানান, ৯ অক্টোবর বিএনপির সন্ত্রাসীরা তাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে হাত-পা ভেঙ্গে দেয়। থানায় মামলা দিতে গেলেও নেয়নি পুলিশ।

গফরগাঁওয়ের কামরঞ্জামান বলেন, ৩ অক্টোবর বিএনপির সন্ত্রাসীরা তার দুই হাতের সবগুলো আঙুল কেটে নিয়ে গেছে।

সিলেটের মীর বাজারের তামিম জানান, তিনি মীরাবাজার হাইক্ষুলে আওয়ামী লীগের পোলিং এজেন্ট ছিলেন। ভুয়া ভোট চ্যালেঞ্জ করায় বিএনপির সন্ত্রাসীরা নির্বাচনের পরের দিন তার ওপর হামলা চালায়। তার একটি হাত, একটি পা ভেঙ্গে দেয় এবং একটি হাতের রগ কেটে দেয়।

সুজানগর সাতবাড়িয়ার ইউপি চেয়ারম্যান শামসুল আলম বলেন, নির্বাচনে তিনি যেন আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ না করতে পারেন এজন্য বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাসীরা ভোটের আগেই তার পায়ের রগ কেটে দিয়েছে।

হবিগঞ্জের চুনারঞ্চাট উপজেলার হাবিবুর রহমান জিতু বলেন, ২৯ সেপ্টেম্বর অতর্কিত বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাসীরা তার ওপর হামলা করে দুই পা ভেঙ্গে দিয়েছে।

নেয়াখালির বেগমগঞ্জের প্রফুল্ল কুমার দেবনাথকে নৌকায় ভোট দেওয়ার কারণে নির্বাচনের দিন সন্ধ্যাতেই বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাসীরা মেরে দুই পা ভেঙ্গে দেয়।

টঙ্গির শান্তি জানান, নির্বাচনে আওয়ামী লীগের হয়ে কাজ করার কারণে ৪ অক্টোবর বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাসীরা তার দুই হাত কেটে নেয়।

২০০১ সালের নির্বাচনের পর এভাবে সারা দেশের প্রতিটি এলাকায় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চলাতে থাকে বিএনপি-জামায়াত। ভোটের পর এক মাস ঘুরতে না ঘুরতেই শতাধিক আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও সমর্থকে বর্বরভাবে খুন করে বিএনপি-জামায়াতের দুর্ভুতরা, পঙ্গ করে দেয় কয়েক হাজার মানুষকে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার কখনোই নির্বিচনে জিতে এরকম প্রতিহিংসার বশে হত্যায়জ্ঞ-লুটপাট চালায় নি, আওয়ামী লীগ কখনো বর্বলতা চালায় না। বিএনপি নির্বাচনে জেতা মানেই দেশেজুড়ে রক্তের বন্যা বয়ে যাওয়া। বিএনপি ক্ষমতায় আসা মানেই লাশের মিছিল, আজীবন পঙ্গুত্ব বহন করে বেড়ানো মানুষগুলোর দীর্ঘশ্বাসে আজও ভারী হয়ে যায় দেশের বাতাস



বরিশালের বানারীপাড়ার বাংলাবাজার এলাকায় একা পেয়ে পাঁচ জন আওয়ামী লীগ কর্মীকে মারধর করে বিএনপির ক্যাডাররা। সুষুপ্তি নির্বাচনের দাবিতে আওয়ামী লীগের দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার কারণে তাদের ওপর এই নৃশংস হামলা চালানো হয়। এমনকি বরিশালের বাক্সের গাঁথনায়ে নিজ বাড়ির সামনে ছাত্রলীগ নেতার হাত কেটে নেয়। বিএনপি কর্মী মাসুমের নেতৃত্বে ফরিদপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সহসভাপতি মামুনের হাত চায়নিজ কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে কেটে নেয় এবং নির্মম প্রহার করে ৮-১০ জন সন্ত্রাসী।

এদিকে শুধু দলীয় ক্যাডারদের দিয়ে হত্যা ও নির্যাতন করেই থেমে ছিল না বিএনপি-জামায়াত জোট। তারা তাদের নিয়োগ করা দলীয় পুলিশদের দিয়ে খুলনার শতাধিক আওয়ামী নেতাকর্মীর নামে হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করে। রাতেই হয়জনকে গ্রেফতার করে তাদের ওপর নির্যাতন চালায়। রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে দূরে রাখার জন্য আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের ওপর এভাবেই হামলা এবং মামলা চলতে থাকে বিএনপি-জামায়াতের পরিকল্পনায়।

সাতক্ষীরায় কেন্দ্রীয় যুবদল নেতা এবং খুলিহর ইউপি চেয়ারম্যান মোদাচ্ছেরুল হক হৃদার নেতৃত্বে একজন আওয়ামী লীগ কর্মীকে বর্বরভাবে হত্যা এবং তিনজনকে গুরুতর আহত করা হয়। নিহত আজিবরের স্ত্রী জানান, ইউপি নির্বাচনে হৃদার পক্ষে কাজ না করায় ও আওয়ামী লীগের সমাবেশে নিয়মিত যাওয়ার কারণে তারা এই হামলা করে এবং চারজনকে নির্মমভাবে মারার পর ডাকাত অভিযোগ দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। থানার ওসি জানান, তারা কেউ ডাকাত নয়। চারজনই স্থানীয় আওয়ামী লীগের কর্মী।



২০০১ থেকে ২০০৬: নাসের রহমানের কুখ্যাত বাহিনীর ভয়ে ঘরছাড়া হয় মৌলভীবাজারের সহস্রাধিক পারিবার

২০০১ থেকে ২০০৬

নাসের রহমানের কুখ্যাত বাহিনীর ভয়ে ঘরছাড়া হয় মৌলভীবাজারের সহস্রাধিক পরিবার

২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত সরকারের সময় সিলেট ও মৌলভীবাজারে সন্ত্রাস ছড়ায় বৰ্ষীয়ান বিএনপি নেতা সাইফুর রহমানের পুত্র নাসের রহমান। ছাত্রদলের বিশাল ক্যাডার বাহিনী দিয়ে পুরো এলাকার গড় ফাদার হয়ে ওঠে নাসের। বিরোধী দল তো বটেই, নিজ দলের সিনিয়র নেতারাও ভয় পেতো নাসেরের বাহিনীকে। এ ব্যাপারে নাসের রহমান নিজেই বলেন, এলাকার লোকজন তাকে যুবরাজ বা সান্দাম হোসেন বলে ডাকে। মৌলভীবাজার বিএনপির সাবেক সভাপতি এবাদুর রহমান চৌধুরী আফসোস করে বলেন, হঠাৎ একদিন শুনি আমি আর সভাপতি নেই, নাসের সভাপতির পদে বসে গেছে। হাইকমানে যোগাযোগ করলাম, তারাও এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারলো না।

মূলত, তারেক রহমান এবং হাওয়া ভবনের প্রভাবে দলীয় কাউঙ্গিল ছাড়াই দলের জেলা সভাপতির পদ দখল করে নাসের। তারেক রহমানের সাথে বনভূমি দখল এবং কেকোর সাথে কমিশন বাণিজ্যের কারণে হাওয়া ভবনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠেছিল নাসের রহমান। এই প্রভাব ব্যবহার করে ছাত্রদলের ক্যাডারদের দিয়ে এলাকায় বিশেষ বাহিনী গঠন করে টর্চার চালাতো সে। সংখ্যালঘু থেকে শুরু করে বিরোধীদল, এমনকি নিজ দলের অন্য গ্রন্থপের লোকদেরও রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করতো নাসেরের বাহিনী।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ২০০৭ সালের ২৫ ও ২৬ জানুয়ারি সমকালের প্রতিবেদন আরো জানায়, মৌলভীবাজার-৩ (সদর ও রাজনগর) আসনে নাসের রহমানকে কমিশন না দিয়ে কোনো উন্নয়ন কাজই হতো না। সাইফুর রহমানের ছেড়ে দেওয়া আসনে উপনির্বাচন জয়ী হয়ে শুরুতেই সরকারি দফতরগুলোকে কৌশলে লুটপাট শুরু করে নাসের। সব প্রতিষ্ঠান থেকে টেক্কারের আগেই কমিশন চলে যেতো নাসেরের কাছে। এমনকি নাসেরের অত্যাচারে হাজারের বেশি আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী নিজ এলাকায় থাকতে পারেনি বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময়।

সাংবাদিক, ঠিকাদার, ব্যবসায়ী কেউই রেহাই পায়নি নাসের রহমানের নির্যাতনের হাত থেকে। ছিনতাইয়ের মামলায় পুলিশ দিয়ে সাংবাদিকদের গ্রেফতার করায়। নির্বাচনে রাজনগর উপজেলায় কম ভোট পেয়েছিল নাসের। একারণে এমপি হওয়ার পর রাজনগরের সংখ্যালঘুদের ওপর নির্মম নিপীড়ন শুরু করে নাসের বাহিনী। ৩০ টি মামলায় শতাধিক ব্যক্তিকে জেলে ঢেকায় এবং সহস্রাধিক সংখ্যালঘু ব্যক্তিকে ঘরছাড়া করে নাসের গং।

২০০৩ সালে ইউপি নির্বাচনে মোস্তফাপুর ইউনিয়নের চাচা রফিকুল ইসলাম মানি মিয়াকে ভোট কারচুপি করে জেতানোর চেষ্টা করে নাসের। এর প্রতিবাদে নাসেরের বিরুদ্ধে ঝাড় মিছিল হয় এলাকায়। প্রতিহিংসা করে নাসের বিজয়ী চেয়ারম্যান শাহেদসহ ৮০০ জনের বিরুদ্ধে মার্মলা করায়। প্রাণ বাঁচাতে শাহেদ লগুনে চলে যায়। এভাবেই পুলিশকে ব্যবহার করে পুরো এলাকাকে জিম্মি করে রেখেছিল নাসের। এমনকি ভূমি দখল থেকে শুরু করে টেন্ডারবাজি, ঠিকাদারি, বনাঞ্চল দখল করে শিল্প কারখানা গড়ে তুলে অবৈধভাবে শত শত কোটি টাকার মালিক হওয়া, বিদেশি কোম্পানিকে কাজ পেতে সহযোগিতা করে কমিশন খাওয়া-এমন কোনো অপকর্ষ নেই যা খালেদা জিয়ার এই এমপি ও তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ বিএনপি নেতা নাসের রহমান করেনি।



চাঁদাবাজি সন্ত্রাস

২০০১: তারেকের ছত্রচায়ায় ছাত্রদলের খুন-ধর্ষণ-চাঁদাবাজিতে পুরো দেশ জিম্মি



২০০১ সালের ২০ অক্টোবর সরকার গঠনের পর, এক মাসের মধ্যেই, দেশজুড়ে হত্যা-ধর্ষণ-দখল-চাঁদাবাজি-লুটতরাজের রাজত্ব কায়েম করে বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীরা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে অন্তর্ভুক্ত প্রশিক্ষণের মহড়া দিতে থাকে ছাত্রদল-শিবির। ছাত্রদল নেতাদের হাতে খুন হতে থাকে আওয়ামী লীগ সমর্থক ও সাধারণ মানুষ। এমনকি স্কুল-কলেজে যাওয়ার পথে মেয়েদের সাথে অশালীন আচরণ, বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে নারীদের ধর্ষণ শুরু করে ছাত্রদলের ক্যাডার। এমনকি চাঁদা না দিলে শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত সর্বোত্তমের ব্যবসায়ীদের ওপরও নির্মম নির্যাতন শুরু করে তারা।

২০০১ সালের ১৯ নভেম্বর দৈনিক জনকষ্টের সংবাদ থেকে জানা যায়, নির্বাচনের পর ছাত্রদলের নেরাজে দেশজুড়ে ভৌতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ছাত্রদলের সঙ্গে তারেক রহমানের সরাসরি সম্পর্ক থাকায় আইনশংগ্রাম বাহিনীও ছাত্রদলকে বাধা দিতে ভয় পেতো। সরকারের মধ্যেই এনিয়ে বিরতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ফলে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ঘোষণা দিয়ে ছাত্রদলের কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করতে বাধ্য হন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। কিন্তু তারেকের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকায় ছাত্রদল নেতাকর্মীদের মাধ্যমে দেশজুড়ে সন্ত্রাস অব্যাহত রাখে ছাত্রদল সভাপতি নাসিরুল্লাহ পিন্টু।

এদিকে ঢাকার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, ফুটপাত টেন্ডার এবং আভারগ্রাউন্ড নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য ছাত্রদল সভাপতি নাসিরুল্লাহ পিন্টুকেই নিয়োজিত করে তারেক রহমান। ফলে ছাত্রদলের কার্যক্রম অফিসিয়াল স্থগিত ঘোষণা করলেও, তা মূলত আইওয়াশ বলে মন্তব্য করে ওই সরকারেই একটি অংশ। কারণ কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণার পরেই 'গ্যাং কালচার'-এর মাধ্যমে আরো বেপরোয়া হয়ে খুন-ধর্ষণ-দখল-চাঁদাবাজি শুরু করে ছাত্রদল।

তৎকালীন সরকারেরই একটা অংশ মনে করতো- নির্বাচনের পরেই পিন্টুর নেতৃত্বে ছাত্রদল সংসদ ভবন দখল, শিক্ষা ভবনের টেন্ডার ছিনতাই, নগর ভবনে সশস্ত্র মহড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত প্রশিক্ষণ, দেশজুড়ে হত্যা-ধর্ষণের ঘটনায় আন্তর্জাতিকভাবে ইমেজ সংকটে পড়েছে বিএনপি-জামায়াত সরকার। তাই ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে খালেদা জিয়া। কিন্তু স্থগিত নাটকের পরে এরা আরো বেশি বেপরোয়া হয়েচে। বিশেষ করে তারেকের ডান হাত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে দেশজুড়ে নাশকতা শুরু করেছে ছাত্রদল সভাপতি নাসিরুল্লাহ পিন্টু। তাই পিন্টুকে সামলাতে না পারলে দেশে সন্ত্রাস থামানো যাবে না। কিন্তু তারেক রহমানের পিন্টুর ওপর খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমানের সরাসরি আশীর্বাদ থাকায়, ছাত্রদলের ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হতো না।

২০০১ থেকে ২০০৬: শীর্ষ সন্ত্রাসীদের মধ্যে ঢাকা শহর ভাগ করে দেয় তারেক, নিয়ন্ত্রণ করতো হাওয়া ভবন থেকে



২০০১ সালের ২০ অক্টোবর সরকার গঠনের পরপরই কারাগারে বল্দি থাকা দেশের শীর্ষ সন্ত্রাসীদের মুক্তি দিতে শুরু করে বিএনপি-জামায়াত সরকার। তারেক রহমানের সরাসরি নির্দেশে তালিকা ধরে ধরে টোকাই সাগর থেকে শুরু করে সব সিরিয়াল কিলারকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর এই শীর্ষ সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে দেশজুড়ে টেঙ্গরবাজি ও ভূমি দখল শুরু করে বিএনপি নেতারা। হাওয়া ভবনের নির্দেশনায় মির্জা আব্বাসসহ ঢাকার চার এমপি এই সন্ত্রাসীদের এলাকা ভাগ করে দেয়। এরপর পুরো শাসনামল জুড়ে এদের মাধ্যমেই অবৈধভাবে কয়েক হাজার কোটি টাকা পকেটে ভরে হাওয়া ভবন চক্র।

ঢাকার টেঙ্গরবাজি নিয়ন্ত্রণ করতে তারেক রহমানের হয়ে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের সঙ্গে কোঅর্ডিনেট করতো বিএনপির যে এমপিরা, তারা হলো- মির্জা আব্বাস, নাসিরগান্দিন পিন্টু, এস এ খালেক ও সালাউদ্দিন আহমদ। এছাড়াও স্থানীয় সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতো ঢাকায় বিএনপির ওয়ার্ড কমিশনার কাইবুম, হাজী রফিক, হাসান এবং মাহমুদা বেগম।

২০০৭ সালের ১১ অক্টোবর, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দৈনিক ইন্ডিফেক পত্রিকায় তথ্য প্রমাণ ও সন্ত্রাসীদের স্থীকারোত্তির ভিত্তিতে এই সংবাদ প্রকাশ হয়।

আন্দারওয়ার্ল্ড ডন কালা জাহাঙ্গীরের শিষ্য তাজ, ইব্রাহিম ও লম্বু সেলিম গ্রেফতার হওয়ার পর সিআইডির জিজ্ঞাসাবাদে এসব তথ্য প্রকাশ করেছে। কালা জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর গ্রন্থ প্রধানের দায়িত্বে থাকা তাজ জানায়, ২০০১ সালের নির্বাচনের আগে তেজগাঁও ছাত্রদলের এজিএস ইমাম ও লম্বু সেলিমের মাধ্যমে হাওয়া ভবনের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তার গুরু কালা জাহাঙ্গীরের। সেসময় নির্বাচনে জিততে যা কিছু করার, সব করার জন্য কালা জাহাঙ্গীরকে অনুরোধ করেছিল তারেক রহমান। বিনিময়ে পরবর্তীতে কালা জাহাঙ্গীরের গ্রন্থকে সর্বোচ্চ সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল হাওয়া ভবন থেকে।

কৃত্যাত খুনি ও সন্ত্রাসী কালা জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল সরাসরি তারেক রহমান, গিয়াসউদ্দিন আল মামুন এবং হারিস চৌধুরী। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং হাওয়াভবনের অন্যতম ক্রীড়নক লুৎফুজ্জামান বাবরের ডান হাত ছিল শীর্ষ সন্ত্রাসী আরমান। তারেক শীর্ষ সন্ত্রাসী টোকাই সাগরকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে মহানগর বিএনপির যুগ্ম সম্পাদকের পদ দেওয়া হয়েছিল তারেকের নির্দেশে। সিরিয়াল কিলার সুব্রত বাইনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল তারেকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু গিয়াসউদ্দিন আল মামুনের। এমনকি মামুনের ব্যবসাতেও সুব্রত কোটি কোটি টাকা লাভ করা ছিল। মিরপুর-পল্লবীর এমপি এস এ খালেক জমিদখল এবং টেঙ্গরবাজির জন্য শীর্ষ সন্ত্রাসী শাহাদাত ও খুরশিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতো। এসব ঢাকার ভাগ পোছে যেতো হাওয়া ভবনে।

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল শীর্ষ সন্ত্রাসী আরমানের। এব্যাপারে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে অপর শীর্ষ সন্ত্রাসী তাজ জানায়, নিজে ভারতে পালিয়ে যাওয়া আগে আরমানকেও পালানোর পরামর্শ দিয়েছিল সে। কিন্তু আরমান বলেছিল- তাকে বাঁচানোর লোক আছে। পরে আরমান আত্মসমর্পণের মধ্যরাতে ক্রসফায়ারের জন্য সাভারের কাছাকাছি পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রতিমন্ত্রী বাবরের ফোন পাওয়ার পর তাকে আবার ফিরিয়ে এনে নিরাপদে রাখা হয়।

**২০০১ থেকে ২০০৬: শীর্ষ
সন্ত্রাসীদের মধ্যে ঢাকা শহর ভাগ
করে দেয় তারেক, নিয়ন্ত্রণ
করতো হাওয়া ভবন থেকে**



২০০৪ সালের ২১ আগস্ট প্রেনেড হামলা করে ও গুলি করে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতৃী শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা করেছিল বিএনপি-জামায়াত সরকার। সেই মিশন ব্যর্থ হলেও, আহতদের চিকিৎসা পর্যন্ত নিতে দেয়নি তারা। এমনকি 'জজমিয়া' নাটক সাজিয়ে এই জঘন্য ঘটনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করেছিল খালেদা জিয়ার সরকার। এমনকি শেখ হাসিনাকে রক্ষাকারী আওয়ামী লীগ নেতাদেরই ফাঁসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল বিএনপি সরকার।

কিন্তু ২০০৭ সালে তৎকালীন সরকারের তদন্তে উঠে আসে এই হত্যাচেষ্টার সাথে জড়িত বিএনপির তিন মন্ত্রী, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমান এবং আওয়ামী লীগের তিন মন্ত্রী হামিদুল আলম বিপুল, মাওলানা আবু সাঈদ এই হামলার তথ্যপ্রমাণ প্রকাশের পর নিজেরাও স্বীকারোক্তি দিয়েছে। এসময় তারা তাদের পৃষ্ঠপোষক ও গড়ফাদার হিসেবে বিএনপির তিন মন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর ছেলে তারেক রহমানের সম্পৃক্ততার কথাও জানায়।

শেখ হাসিনাকে হত্যাচেষ্টার সাথে জড়িত বিএনপির তিন মন্ত্রী হলো- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী, প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু এবং তার ভাই মাওলানা তাজউদ্দীন। এরা নিয়মিত অর্থ ও তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতো জিসিদের। তবে শেখ হাসিনাকে হত্যার মিশন ব্যর্থ হওয়ার পর প্রেনেড হামলার মাঠ পর্যায়ের তত্ত্বাবধায়ক মাওলানা তাজউদ্দীনকে নিরাপদে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয় তারেক রহমান।

মুফতি হানান আরো জানায়, কোটালিপাড়ায় বোমা পুঁতে শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল। সেই চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায়, পরে ২১ আগস্ট প্রেনেড হামলা করে শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। মুফতি হানান নিজে মাঠে থেকে পুরো ঘটনা তাদারকি করেছিল। পরে একটি আয়াস্কালেসে করে করে তারা ঘটানাক্তল ত্যাগ করে। এমনকি তাদের কিছু হবে না বলেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী আশ্বাস দিয়েছিল বলেও স্বীকার করে সে।

এই মামলায় পরবর্তীতে লুৎফুজ্জামান বাবরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে জানায়, মুফতি হানান তার পরিচিত। হামলার আগে মন্ত্রী পিন্টুর টাঙ্গাইলের বাসা এবং মাওলানা তাজউদ্দীনের বাসায় বৈঠকের কথাও স্বীকার করে সে। এমনকি হাওয়াভবনে তারেক রহমানের সাথে জিসিদের একবার একটি বৈঠকের কথাও উঠে এসেছে সবার স্বীকারেক্তিতে।

বিএনপির শাসনামল: মির্জা আব্বাসের লাগামহীন দুর্নীতি এবং বেপরোয়া জবর-দখল-সন্ত্রাস



বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের শেষের দিকে, টেক্ডার ছাড়াই সম্পূর্ণ অবৈধভাবে রেলওয়ের ২ একর জমি একটি কাণ্ডজে প্রতিষ্ঠানকে লিজ দেয় গণপৃত মন্ত্রী মির্জা আব্বাস। এই সম্পদের মূল্যের পরিমাণ ছিল তখন কমপক্ষে ৫১ কোটি টাকা। হাওয়া ভবনের নির্দেশে মাত্র ১৪ দিনের মধ্যে এর পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ এই বিএনপি নেতা। অর্থাৎ রেলওয়ের জমি গণপৃত মন্ত্রণালয়ের অধীনেই নয়, এটি করার আইনগত অধিকার তার নাই।

এমনকি যে সমিতির নামে জমিটি ১৯ বছরের জন্য লিজ দেওয়া হয়েছে, সেই সমিতির নামও সমবায় অফিসের তালিকায় খুঁজে পাওয়া যায়নি। ২০০৭ সালের ২৮ জুলাই দৈনিক জনকষ্ঠ পত্রিকার সংবাদে এসব তথ্য প্রকাশ করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর রেলওয়ের পক্ষ থেকে তাদের জমির ন্যায্য দখল ফিরে পাওয়ার দাবি জানালে, বিষয়টি দুর্নীতি দমন কমিশনের নজরে আসে।

জানা যায়, ২০০৬ সালের অক্টোবরে বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতা ছাড়ার আগে এটাই মির্জা আব্বাসের শেষ দুর্নীতি। মাত্র ১৪ দিনের মধ্যে পূর্বাচল সমবায় সমিতির নামক একটি কাণ্ডজে প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ১ কোটি ৪৬ লাখ টাকা ক্যাশ জমা নিয়ে জমির দখল বুঝিয়ে দেওয়া হয়। রেলওয়ের মালিকানাধীন ওই জমির একটি অংশে, রেলওয়ের অনুমোদক্রমে একটি প্রতিষ্ঠান লিজ নিয়ে ব্যবসা করছিল, পেশী শক্তি খাটিয়ে তাদেরও সেখান থেকে ভাগিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় রেলওয়ে প্রতিবাদ জানালেও মির্জা আব্বাসের ক্যাডার বাহিনীর প্রতাপের কাছে হেরে যায় তারা।

বিএনপি আগলে এভাবেই সন্ত্রাসীদের ক্ষমতার দাপটে নিয়মনীতির তোয়াক্ত করা হয়নি কোথাও। এমনকি সরকারি কর্মচারীদেরও হৃষকি-ধার্মকি ও সন্ত্রাসী আচরণ চালিয়ে গেছে বিএনপি-জামায়াতের এমপি-মন্ত্রীরা। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এ বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার ভাই-ভাণ্ডেসহ অন্যান্য স্বজন এবং মোসাদ্দেক আলী ফালুর নামেও রাষ্ট্রে ৮০০ কোটি টাকার জমি জালিয়াতি করে দলিল করে দিয়েছিল এই আবাস। এমনকি তারেক রহমানের হয়ে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতো ঢাকার যে চারজন এমপি, আবাস তাদের মধ্যেও অন্যতম।



খালেদা জিয়ার দুর্নীতিবাজ সুরকারুঃ ভূমি দস্তুতা ও চাঁদাবাজি করে শুন্য থেকে শত কোটির মালিক আমানউল্লাহ আমান



বিএনপি-জামায়াত শাসনামলের হাওয়া ভবন চক্র এবং খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমানের অন্যতম ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি আমানউল্লাহ আমান। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত খালেদা জিয়ার প্রতিমন্ত্রী থাকা অবস্থায় প্রভাব খাটিয়ে ঠিকাদারি কাজের কমিশন, চাঁদাবাজি এবং ভূমি দখল করে অবৈধভাবে শত কোটি টাকার মালিক হয় সে। ২০০৭ সালে নিদলীয় তত্ত্ববধায়ক সরকারের সময় নিরপেক্ষ তদন্তের পর দুর্নীতিবাজের নাম প্রকাশ করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, এরপর ২৩ বিএনপি নেতার ২২৬ কোটি অবৈধ টাকা উদ্ধার করে সরকার। এদের মধ্যে অন্যতম শীর্ষ দুর্নীতিবাজ হলো এই আমান। ২০০৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় এই খবর প্রকাশ হয়।

জানা যায়, ২০০৭ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে উঠে আসে সাবেক এই ছাত্রদল নেতার সীমাহীন দুর্নীতির চিত্র। স্থানীয়রা জানান, কেরানীগঞ্জের এক কৃষক পরিবারে জন্ম আমানের। পারিবারিক সুত্রে কোনো সম্পদ ছিল না তার। কিন্তু বিএনপির দুই মেয়াদে মন্ত্রী থাকার পর ঢাকা ও ঢাকার বাইরে কয়েক হাজার শতক জমি দখল করে সে। এসব জমি আমান ও তার স্ত্রী সাবেরা আমানের নামে দলিল করা হয়। তত্ত্ববধায়ক সরকারের সময় দুর্নীতি দমন কমিশন তার ৩২টি ফ্লাটের হিসেব পায় ঢাকার অভিজাত এলাকায়।

তত্ত্ববধায়ক সরকারের সময় দুর্নীতি দমন কমিশন তার ৩২টি ফ্লাটের হিসেব পায় ঢাকার অভিজাত এলাকায়।

দুদক জানায়, এছাড়াও গুলশানে ৬ কাঠা জমির ওপর ৬ তরা বাসা, কেরানীগঞ্জে ৪ একর ৭৬ শতাংশ জমির ওপর বাড়ি, মানিকগঞ্জসহ মোট ৫০১ শতক জমির মালিকানা সম্পদ হিসেবে দেখিয়েছে সে। কিন্তু এর বাইরে আরও প্রায় দেড় হাজার শতক জমির তথ্যও উদ্ধার করে দুদক। কোনো আয় না থাকলেও মিরপুরে ১০ শতক জমির ওপর ৬ তলা আলিশান বাড়ি, বনানীতে ৪ কাঠা জমির ওপর ৩ তলা বাড়ি, কেরানীগঞ্জে ৫০২ শতক জমির ওপর বহুতল ভবন, এবং কেরানীগঞ্জে আরেও ৬৬০ শতক জমির পাওয়া যায় আমানের স্ত্রীর নামে।

এমনকি সাভারের জমি, ঢাকার পেট্টোল পাম্প, গার্মেন্টসসহ অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলে আমান ও তার স্ত্রী। শুধু তাই নয়, আমানের মতো তার স্ত্রীও স্বামীর প্রভাব খাটিয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করতো। ঢাকা-মাওয়া মহাসড়কের ধলেশ্বরী সেতুর টোল আদায়ের ইজারা পাইয়ে দিতে ব্যাংক চেকের মাধ্যমে ঠিকাদারি খোরশেদ আলমের কাছ থেকে ৭০ লাখ টাকা আগাম নেয় সে। ২০০৭ সালের ১৯ জুন প্রথম আলো পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, তত্ত্ববধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক খোরশেদ আলম এই তথ্য প্রকাশ করেছেন।

এভাবেই সীমাহীন অপকর্মের মাধ্যমে দেশকে দুর্নীতিতে পাঁচ বার বিশ্ব চাম্পিয়ন করে বিএনপি-জামায়াত সরকার। তাদের নিরলস লুটপাটে ভেঙে পড়ে দেশের অর্থনীতি।

পরবর্তীতে গত এক দশক ধরে— বিএনপি-জামায়াতের জুলাও-পোড়াও রাজনীতি, মানুষ হত্যা, সাম্প্রদায়িক উক্ষানি দিয়ে দাঙ্গা সৃষ্টি এবং নাশকতার মদতদাতা হিসেবে বারবার ফিরে এসেছে এই দুর্নীতিবাজ বিএনপি নেতার নাম। সাধারণ মানুষের কাছে এরা এখন ভীতিকর ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। এরা কোনো রাজনীতিবিদ নয়, রাজনীতির ছবিবেশে এরা জনগণের সম্পদের লুটপাটকারী, দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসের হোতা। এদের উগ্রতা থেকে মুক্তি চায় সাধারণ জনগণ।

বিএনপি-জামায়াত অপশাসন: জবর-দখল, টেক্নোরবাজি, এবং সন্ত্রাসের মাধ্যমে ঢাকাকে অস্থির করে তোলে নাসিরউদ্দিন পিন্টু



পিন্টুর নাম শুনলে - ভয়ে সেই স্থান ছাড়ে চলে যেতো লোকজন, রাজধানীর বুকেও এমন দিন গেছে একসময়। ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত খালেদা জিয়ার শাসনামলের সামাজিক পরিস্থিতি এটাই। বিএনপি নেতা নাসিরউদ্দিন পিন্টুর সন্ত্রাসের কথা বলছি। ঢাকার শীর্ষ সন্ত্রাসীদের সমন্বয়ের দায়িত্ব দিয়েছিল তাকে তারেক রহমান। হাওয়া ভবনের পক্ষ থেকে সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে রাজধানীর টেক্নোর ও ঠিকাদারি নিয়ন্ত্রণ করতো সে। এছাড়াও নিরীহ মানুষের জমি ও বাড়ি দখল, সরকারি নদী দখল, অর্থ পাচার, এসব ছিল তার প্রাত্যক্ষিক ঘটনা। ২০০৭ সালের ১১ অক্টোবর দৈনিক ইন্ডিফাক পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকজন শীর্ষ সন্ত্রাসীর স্বীকারেণ্টির ভিত্তিতে এসব তথ্য জানা যায়।

২০০৭ সালে নির্দলীয় তত্ত্ববধায়ক সরকারের সময় নিরপেক্ষ তদন্তে পিন্টুর সীমান্তীন অপকর্ম ও দুর্নীতির কিছু অংশ তথ্যপ্রমাণসহ প্রকাশ হয়ে পড়ে। জানা যায়, অবৈধ সম্পদ অজনের তালিকায় তারেক ও তার বন্ধু গিয়াস উদ্দিন আল মামুনের সঙ্গে শীর্ষ তালিকায় যারা আছে; তাদের অন্যতম একজন হলো এমপি নাসিরউদ্দিন পিন্টু। ২০০৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর দৈনিক সংবাদ পত্রিকার প্রতিবেদনে জানা যায়, খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমানের সঙ্গে হাওয়া ভবনে সিঙ্গেকেট গড়ে সরকারি ও বেসরকারি খাতে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট করে বিএনপি নেতারা।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও পেশীশক্তি ব্যবহার করে দেশের নদীগুলোর ওপর জবর-দখল চালায় বিএনপি-জামায়াতের শীর্ষ নেতারা। ফলে স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়, নাব্য হ্রাস পায় নদীগুলোর, দীর্ঘমেয়াদের জন্য বিপর্যয় ঘটে দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুর। এই নদী খেকোদের প্রধানতম একজন হলো নাসিরউদ্দিন পিন্টু। ২৫ জানুয়ারি ২০০৭ সালের প্রথম আলো পত্রিকায় ছবিসহ এবিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। প্রতিবেদনে উঠে আসে- ঢাকার বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদীর পাড় ঘেঁষে ৪০ কিলোমিটার এলাকায় জবর-দখল চালানো চক্রটি হলো- বিএনপির প্রতিমন্ত্রী ইকবাল মাহমুদ টুকু; সংসদ সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদ, নাসিরউদ্দিন পিন্টু, ওয়ার্ড কমিশনার মনোয়ার হোসেন ডিপজল।

পুরান ঢাকার দিকে মিটফোর্ড হসপিটালের পেছনের অংশে নদীতে একক দখল ছিল পিন্টুর। নদী ভরাট এবং শত শত অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করে অবৈধভাবে কোটি কোটি টাকা আয় করে সে। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তাদের বারবার নোটিশ দিলেও কোনো কাজ হয়নি। সরকারের ক্ষমতা দেখিয়ে আরও দিগ্নণ গতিতে দখল চালিয়েছে।

এমনকি এতিমের সম্পদ দখল করতেও পিচপা হয়নি এই পিন্টুরা। ২০০৭ সালের ১৮ অক্টোবরের দৈনিক ইত্তেফাক জানায়, সন্তাসী বাহিনীর শক্তি খাটিয়ে ঢাকায় দেড়শ বছরের পুরনো ওয়াকফ করা এতিমখানা দখল করে বিক্রি করে দিয়েছে বিএনপির এমপি নাসিরউদ্দিন পিন্টু। সংরক্ষিত নারী আসনের এমপি ও এতিমখানা পরিষদের চেয়ারম্যান সামসুন নাহারের সহযোগিতায় লালবাগের সলিমল্লাহ এতিমখানার দই বিঘা জমি বিক্রি করে দেয় সে। এরপর সেই জমিতে একটি ১৬ তলা এবং একটি ২১ তরা ভবন নির্মাণ করে হাউজিং কোম্পানি। এলাকাবাসী বাধা দিলে পিন্টুর নির্দেশে স্থানে আনসার-ক্যাম্প স্থাপন করে নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাওয়া হয়।

বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসকের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রভাবশালী পিন্টুসহ বিএনপি নেতাদের প্রভাবের কারণে আইনশঙ্খলা বাহিনীও এই অবৈধ দখল এবং ভবন নির্মাণের কাজ থামাতে পারেনি। এই জবর-দখলের বিষয় জানিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান এবং সেনাপ্রধানের হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়।

এছাড়াও, সিএনজি স্টেশন বসানোর নামে রাজধানীর রেলওয়ে, সড়ক ও জনপথ বিভাগের সরকারি জমির দখল নিয়েছিল যেকজন বিএনপি নেতা; তাদের মধ্যে অন্যতম এই পিন্টু। ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়, ৬ এপ্রিলের জনকঠ এবং ১১ এপ্রিলের প্রথম আলো পত্রিকার সংবাদ থেকে জানা যায়- ২০০৩ সালে এসব জমি বরাদ্দ হয়, নিয়মানুযায়ী ৬ মাসের মধ্যে স্টেশন স্থাপনের কথা থাকলেও ৩ বছরের বেশি সময়েও কিছুই করেনি তারা। ফলে স্টেশনের অভাবে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত গাড়ির লাইন হতে শুরু করে, চরম দুর্ভোগে নিমজ্জিত হয় ঢাকার পরিবহন সেক্টর ও কর্মজীবী মানুষ।

সওজ এবং রেলওয়ে স্টেশনে জানা যায়- অনেকে তো জমি নেওয়ার পরেও স্টেশন স্থাপন করেনি, এমনকি ইজরার টাকাও শোধ করেনি। বিএনপি নেতাদেরই আরেকটি স্টেশনে জানা যায়- যে নেতারা স্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ নিয়েছেন; তারাই আবার তাদের তাদের ভাই, বেয়াই, বন্ধুদের নামেও একাধিক স্টেশনের মালিকানা ও জমি বরাদ্দ নেয়।

পিন্টুর ইচ্ছার বাইরে কেউ টেন্ডার নিতে গেলে তার পরিণত হতো ভয়াবহ। এমনকি বাণিজ্য মেলা বা কিংবা কোরবানির পশুর হাটের টেন্ডারেও কেউ অংশ নিতে পারতো না। মন্ত্রণালয় এবং অধিদফতরের বাইরে নিজস্ব বাহিনীর সশস্ত্র পাহাড় বসাতো পিন্টু। শুধু অফিসের কর্মচারী ছাড়া আর কেউ অফিসে প্রবেশ করতে পারতো না। ফলে এককভাবে টেন্ডার পেয়ে যেতো সে। এভাবে পুরান ঢাকায় সালিশ-বৈঠকের নামে নিয়মিত স্বেচ্ছাচারিতা এবং সন্তাসী কার্যক্রম চালিয়ে গেছে সে। এমনকি ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় যাওয়ার পরপরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে ছাত্রলীগ ও অন্যান্য সংগঠনের নেতাকর্মীদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালায় পিন্টুর অনুগত বাহিনী। আজও সেসব কথা মনে পড়লে শিউরে ওঠেন অনেকে



২০০১ থেকে ২০০৬: নাসের রহমানের কুখ্যাত বাহিনীর ভয়ে ঘরছাড়া হয় মৌলভীবাজারের সহস্রাধিক পরিবার



২০০১ থেকে ২০০৬

নাসের রহমানের কুখ্যাত বাহিনীর ভয়ে ঘরছাড়া হয় মৌলভীবাজারের সহস্রাধিক পরিবার

২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত সরকারের সময় সিলেট ও মৌলভীবাজারে সন্ত্রাস ছড়ায় বৰ্ষীয়ান বিএনপি নেতা সাইফুর রহমানের পুত্র নাসের রহমান। ছাত্রদলের বিশাল ক্যাডার বাহিনী দিয়ে পুরো এলাকার গড় ফাদার হয়ে ওঠে নাসের। বিরোধী দল তো বটেই, নিজ দলের সিনিয়র নেতারাও ভয় পেতো নাসেরের বাহিনীকে। এ ব্যাপারে নাসের রহমান নিজেই বলেন, এলাকার লোকজন তাকে যুবরাজ বা সান্দাম হোসেন বলে ডাকে। মৌলভীবাজার বিএনপির সাবেক সভাপতি এবাদুর রহমান চৌধুরী আফসোস করে বলেন, হঠাৎ একদিন শুনি আমি আর সভাপতি নেই, নাসের সভাপতির পদে বসে গেছে। হাইকমানে যোগাযোগ করলাম, তারাও এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারলো না।

মূলত, তারেক রহমান এবং হাওয়া ভবনের প্রভাবে দলীয় কাউন্সিল ছাড়াই দলের জেলা সভাপতির পদ দখল করে নাসের। তারেক রহমানের সাথে বনভূমি দখল এবং কোকোর সাথে কমিশন বাণিজ্যের কারণে হাওয়া ভবনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠেছিল নাসের রহমান। এই প্রভাব ব্যবহার করে ছাত্রদলের ক্যাডারদের দিয়ে এলাকায় বিশেষ বাহিনী গঠন করে টর্চার চালাতে সে। সংখ্যালঘু থেকে শুরু করে বিরোধীদল, এমনকি নিজ দলের অন্য গ্রন্তির লোকদেরও রিমানে নিয়ে নির্যাতন করতো নাসেরের বাহিনী।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ২০০৭ সালের ২৫ ও ২৬ জানুয়ারি সমকালের প্রতিবেদন আরো জানায়, মৌলভীবাজার-৩ (সদর ও রাজনগর) আসনে নাসের রহমানকে কমিশন না দিয়ে কোনো উন্নয়ন কাজই হতো না। সাইফুর রহমানের ছেড়ে দেওয়া আসনে উপনির্বাচন জয়ী হয়ে শুরুতেই সরকারি দফতরগুলোকে কৌশলে লুটপাট শুরু করে নাসের। সব প্রতিষ্ঠান থেকে টেক্ডারের আগেই কমিশন চলে যেতো নাসেরের কাছে। এমনকি নাসেরের অত্যাচারে হাজারের বেশি আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী নিজ এলাকায় থাকতে পারেনি বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময়।

সাংবাদিক, ঠিকাদার, ব্যবসায়ী কেউই রেহাই পায়নি নাসের রহমানের নির্যাতনের হাত থেকে। ছিনতাইয়ের মামলায় পুলিশ দিয়ে সাংবাদিকদের গ্রেফতার করায়। নির্বাচনে রাজনগর উপজেলায় কম ভোট পেয়েছিল নাসের। একারণে এমপি হওয়ার পর রাজনগরের সংখ্যালঘুদের ওপর নির্মম নিপীড়ন শুরু করে নাসের বাহিনী। ৩০ টি মামলায় শতাধিক ব্যক্তিকে জেলে ঢেকায় এবং সহস্রাধিক সংখ্যালঘু ব্যক্তিকে ঘরছাড়া করে নাসের গং।

২০০৩ সালে ইউপি নির্বাচনে মোস্তফাপুর ইউনিয়নের চাচা রফিকুল ইসলাম মানি মিয়াকে ভোট কারচুপি করে জেতানোর চেষ্টা করে নাসের। এর প্রতিবাদে নাসেরের বিরুদ্ধে ঝাড় মিছিল হয় এলাকায়। প্রতিহিংসা করে নাসের বিজয়ী চেয়ারম্যান শাহেদসহ ৮০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করায়। প্রাণ বাঁচাতে শাহেদ লঙ্ঘনে চলে যায়। এভাবেই পুলিশকে ব্যবহার করে পুরো এলাকাকে জিম্মি করে রেখেছিল নাসের। এমনকি ভূমি দখল থেকে শুরু করে টেক্ডারবাজি, ঠিকাদারি, বনাঞ্চল দখল করে শিল্প কারখানা গড়ে তুলে অবেধভাবে শত শত কোটি টাকার মালিক হওয়া, বিদেশ কোম্পানিকে কাজ পেতে সহযোগিতা করে কমিশন খাওয়া-এমন কোনো অপকর্ষ নেই যা খালেদা জিয়ার এই এমপি ও তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ বিএনপি নেতা নাসের রহমান করেনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস

২০০১ সাল: ক্ষমতায় এসেই
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লুটপাট,
সন্ত্রাস ও নির্যাতন শুরু করে
ছাত্রদল-শিবির



২০০১ সালের ১ অক্টোবর অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত জোটের বিজয়ের পরপরই দেশজুড়ে পাশবিক অত্যাচার শুরু করে ছাত্রদল ও শিবিরের সন্ত্রাসীরা। এমনকি বিজয় উদয়াপনের মিষ্টিগুলো পর্যন্ত দোকান থেকে লুট করে নিয়ে আসে তারা, ভাঙ্গুর চালায় দোকানে দোকানে। এমনকি নির্বাচনের রাত থেকে তারা টানা নিপীড়ন চালাতে থাকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর। রাতভর বিভিন্ন ছাত্রাবাসে লুটপাট ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর মারধর করে চাঁদাবাজি চালাতে থাকে ছাত্রদল-শিবিরের নেতাকর্মীরা।

এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা কলেজসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের মেরে বের করে দেয় ছাত্রদল-শিবিরের সন্ত্রাসীরা।

৫ অক্টোবর, ২০০১ সালের প্রথম আলো পত্রিকায় এ বিষয়ে অনেকগুলো প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো দখলের পর ছাত্রদল-শিবিরের নেতাকর্মীরা ছাত্রলীগের ছেলেদের রুমে রুমে অভিযান চালিয়ে তাদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র লুটপাট করে। ছাত্রলীগের ছেলেদের রুমে রুমে ভাঙ্গুর চালায় তারা। অনেক সাধারণ শিক্ষার্থী তাদের বেধডুক মারের শিকার হয়। এমনকি ছাত্রদল কর্মীদের সহায়তায় ঢাবির হলগুলোতে বহিরাগত সন্ত্রাসীরাও আস্তানা গেড়ে বসে। ঢাকা কলেজের হলগুলোতে ছাত্রলীগের ছেলেদের রুমে রুমে ভাঙ্গুর ও অগ্নিসংযোগ করে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।

এছাড়াও ঢাকা মেডিক্যালের হলে টানা কয়েকদিন ধরে নির্যাতন চালানো হয় ছাত্রলীগ সমর্থিত ইন্টার্ন চিকিৎসকদের ওপর। অনেককে পিটিয়ে হাত-পা ভেঙে দেওয়া হয়। ফাটা মাথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরও নিরাপত্তাহীনতার কারণে হাসপাতাল ছাড়তে বাধ্য হন ছাত্রলীগ সমর্থক হিসেবে পরিচিত শিক্ষার্থীরা ও ইন্টার্ন চিকিৎসকরা।



দখল ও টেঙ্গারবাজি

২০০১ থেকে ২০০৬: ভূমি
দখল ও দুনীতিতে মগ্ন ছিল
খালেদা জিয়ার মন্ত্রী এবং
মেয়রেরা।



খালেদা জিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী ও বরিশালের সিটি মেয়র মজিবর রহমান সারোয়ারের দুনীতির রেশ পৌঁছে যায় দেশের সীমা পেরিয়ে বিদেশেও। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত জোট এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পরিবারের সদস্যদের সীমাহীন লুটপাট ও অর্থ পাচারের কারণে পাঁচবার দুনীতিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ। ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পর দুনীতিবাজদের ধরপাকড় শুরু হলে, তাদের অপকর্মের তথ্যপ্রমাণসহ সংবাদ প্রকাশ করে গণমাধ্যমগুলো।

২০০৭ সালের ৮ জুলাই যুগান্তর পত্রিকার খবরে জানা যায়- বিএনপি নেতা আলতাফ ও সারোয়ারের বাড়ি-গাড়ি-মিল-কারখানা এবং অচেল টাকার খোঁজ পেয়েছে দুনীতি দমন কমিশন। কিন্তু এসব অর্থের উৎস খুঁজে পেতে হিমশিম খেয়েছে তারা। তদন্ত কর্মকর্তারা জানান, ভূমি দখল করে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছে এই নেতারা।

আলতাফ চৌধুরীর গুলশানে ১০ কাঠা জমির ওপর যে বাড়ি, সেটার ৫ কাঠা সরকারি জায়গা। সরকারের প্রভাবে ভূমি দখল করে বাড়ি করেন তিনি। এছাড়াও পটুয়াখালি এবং মির্জাগঞ্জে তার একাধিক বাড়ি ও জমি রয়েছে। পটুয়াখালীর কাজীপাড়ায় যে বাড়ি নির্মাণ করেন, তার আগে অন্য একজনের বাড়িঘর ভেঙে ফেলেন। এছাড়া ঢাকায় ভাইদের নামে প্লট ও ফ্লাট অর্জন করেন। মন্ত্রী থাকাকালে জিএসপি লিজিং কোম্পানির ছদ্মবেশে কয়েক শ' কোটি টাকার মালিক হন তিনি। এমনকি পাকিস্তানে তার একটি স্পিননিং মিলসহ কয়েকটি দেশে তার আরো ব্যবসা থাকার অভিযোগ ওঠে। এছাড়াও তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলোতে কোটি কোটি টাকা সন্ধান পাওয়া যায়।

এদিকে বরিশালের মেয়র মজিবর রহমান সারোয়ারের বাসায় তল্লাশি চালিয়ে ২৬টি দলিল ও কোটি টাকার বাস্তিল পাওয়া যায়। দলিলগুলোর বিপরীতে যে জমি ও সম্পদ, তার মূল্য শত কোটি। এমনকি ৫ বছরে ইসলামি ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে কোটি কোটি টাকা লেনদেনের প্রমাণ পায় দুদক। নগরীতে নিজের বসতবাড়ি যেটা নির্মাণ করেছেন মেয়র, সেটাও অর্পিত সম্পত্তির ওপর। অবেদ্ধভাবে ভূমি দখল করে বাড়ি নির্মাণ করে এই বিএনপির এই নেতা। ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী ও গুলশানে ফ্লাট এবং বনানী ও উত্তরায় প্লটের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর বাইরে ঢাকার দুটি ব্যাংকে তার বিপুল অঙ্কের অর্থ রয়েছে, যেগুলোর কোনো বৈধ উৎস নাই।

বিএনপি-জামায়াতের শাসনামলে এভাবেই তাদের মন্ত্রী থেকে নেতা-কর্মীরা সবাই লুটপাট করে সর্বস্বান্ত করে বাংলাদেশকে।

২০০১ থেকে ২০০৬: পুলিশকে মুরব্বি ভূমি দখল ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে আসের রাজত্ব গড়ে তোলে এমপি শহিদুল



পটুয়াখালীর বাউফল থেকে ২০০১ সালে এমপি হওয়ার আগেও উপজেলা পরিষদের সামনে একটি টিনশেড বাড়িতে ভাড়া থাকতে শহিদুল আলম তালুকদার। কিন্তু বিএনপি থেকে এমপি হওয়ার পর রাতারাতি বদলে যায় তার ভাগ্য। দুর্নীতি, সরকারি জমি দখল, টিআর-কাবিখা লুটপাট এবং সন্ত্রাসী বাহিনীর মাধ্যমে চাঁদাবাজি করে কোটি কোটি টাকার মালিক হয় সে। স্বল্প সময়ের মধ্যে পৌরশহরের বাংলাবাজারে ৪৬ শতক জমির ওপর গড়ে তোলে সুরম্য দ্বিতল বাড়ি। বনানীতে কেনেন আধুনিক ফ্লাট। চলতে শুরু করে পাজেরো নিয়ে। কালিসুরি বন্দরে খাস জমি দখল করে গড়ে তোলে মাকেট ও বাড়ি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর, ২০০৭ সালের ১৫ মার্চের প্রথম আলো পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশ হয়। জানা যায়- শহিদুল আলম তালুকদারের অত্যাচার এতেটাই অসহনীয় হয়ে উঠেছিল যে, শেষ পর্যন্ত ২০০৫ সালে নিজ দলের লোকরাও তার বিরুদ্ধে 'শহীদুল আলমমুক্ত বাউফল বিএনপি চাই' শীর্ষক প্রতিবাদ সমাবেশ করেছিল। বিরোধী দলের ওপর নিয়ন্তন তো চলতোই, তার বিরুদ্ধে কিছু বললে পুলিশ ও সাংবাদিক পেটানোটাও ছিল তার জন্য খুব সাধারণ ঘটনা।

জানা যায়, সংসদ সদস্য হওয়ার পর এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের নিয়ে যুবদল ও ছাত্রদলের বিভিন্ন কমিটি গঠন করে শহিদুল। তাদের মাধ্যমেই টিআর, কাবিখা, কাবিটা, টেভার, ইজারা, চাঁদাবাজির ভাগবাটোয়ারা করতো সে। এলাকার লোকজন সেই সন্ত্রাসীদের নাম দিয়েছিল 'এমপির কামাইর পুর'। তার বাহিনীর কেনো সন্ত্রাসী পুলিশের হাতে আটক হলে নিজে তাদের ছিনয়ে আনতেন এমপি শহিদুল। পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় এই সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করে র্যাব।

২০০২ সালে তার অপকর্মের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করায়, ৮ মে স্থানীয় প্রভাষক ও সাংবাদিক মঞ্জুর মোশেদেকে পিটিয়ে আহত করে এবং এলাকাছাড়া করে একাধিক সাংবাদিককে। এরপর প্রেসক্লাবে তালা দেয়। ২০০৪ সালে বাউফল থানায় চুকে ওসি কাজী হানিফকে মারধর করে শহিদুল। এমনকি আওয়ামী লীগ করার কারণে এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে পিটিয়ে দিগন্বর করে ঘোরায় তার ক্যাডার বাহিনী।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে তাকে আর এলাকায় দেখা যায়নি। তবে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ঘুরছে এমপি শহীদুলের সন্ত্রাসের কাহিনী। তারা বলছেন, কিছুদিন আগ পর্যন্ত খুব শান্ত নগর হিসেবে পরিচিতি ছিল বাউফলের। কিন্তু এমপি শহীদুল একে ভয় ও সন্ত্রাসের নগরীতে পরিণত করেছে।

খালেদা জিয়ার শাসনামল: রাজাকার সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর দখল, দুর্নীতি, অশ্লীলতা ও বর্বর সন্ত্রাসী কার্যক্রমে বিপর্যস্ত রাষ্ট্র!



১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যেকঠিপি পরিবার মুক্তিযোদ্ধা এবং অসহায় নারীদের ওপর বর্বর নির্যাতন চালিয়েছে, তাদের মধ্যে শীর্ষতম হলো রাজাকার সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার তাকে নিজের উপদেষ্টা বানান। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত শাসনামলে শত শত বিঘা জমি দখল করে সে। ভোট জালিয়াতি, হস্তির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার, সংখ্যালঘু নির্যাতন, বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্যে দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উক্ষানি, এমনকি লবিস্ট নিয়োগ করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশবিশ্বোধী ষড়যন্ত্র এবং অপপ্রচারের অন্যতম হোতা এই ব্যক্তি।

২০০৭ সালে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় তার অবৈধ সম্পদের হিসাব মেলাতে হিমশিম খেয়েছে স্বয়ং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। ৩ মার্চ ২০০৭ সালের দৈনিক জনকৃষ্ণ পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, দুদকে জমা দেওয়া তথ্যের সাথে সাকা চৌধুরীর সম্পদ এবং আয়ের বাস্তবতার কোনো মিল নেই। দেশে বিদেশে নামে-বেনামে শত শত কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে তার। বর্তমান হিসেবে সেটি হাজার কোটির বেশি। দুদকের অনুসন্ধানে পাওয়া তার কিছু সম্পদের মধ্যে- ঢাকার ধানমণ্ডিতে ৩৩ শতক জমির ওপর বাড়ি, দক্ষিণখানে ৯১ শতক জমির ওপর বাড়ি, চট্টগ্রামের বাকালিয়া-রাঙ্গুনিয়া-রাউজানে জমি ও বাড়ি নিজের নামে। এছাড়াও গৃহিণী স্ত্রীর নামে গুলশানে ১০ একর জমির ওপর বাড়ি এবং ধানমণ্ডিতে ২টি ফ্লাট। এছাড়াও কিউসি গ্রন্পের ১৫টি প্রতিষ্ঠানে নিজের, স্ত্রী ও সন্তানদের নামে-বেনামে শত কোটি টাকার শেয়ার উল্লেখযোগ্য। এমনকি একটি টেলিভিশন চ্যানেল চালু প্রক্রিয়াও চলছিল সাকা চৌধুরীর মালিকানায়।

এর বাইরে দুদকে জমা দেওয়া সম্পদের হিসেবে চট্টগ্রামের ১৫টি বাড়ি এবং প্রায় ৫০ বিঘা জমি, কিউসি গ্রন্পের ১৫টি কোম্পানির শেয়ারের মূল্যসহ মোট আয় দেখিয়েছে সে মাত্র ৬ লাখ টাকা। অর্থচ সব সম্পদের মূল্য কয়েকশ কোটি টাকা। নিয়মিত অশ্লীল রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়ে দেশব্যাপী সমালোচিত এই ব্যক্তি জালিয়াতিতেও ছিল মাস্টারমাইন্ড। এমনকি নামে-বেনামে প্রায় হাজার কোটির বেশি অর্থ পাচারের সঙ্গেও তার সম্পৃক্ততা খুঁজে পায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। সেইসব অর্থ দিয়েই পরবর্তীতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচালের অপচেষ্টা করে সে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদারদের এই সহযোগী শুধু অশ্লীলতাতেই থেমে ছিল না। সন্ত্রাস ও জবর-দখল ছিল তার নিয়মিত কর্মান্বেল একটি। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত খালেদা জিয়ার আমলে, চট্টগ্রামে ১৪৪ একর সরকারি জমি দখল করে যুদ্ধাপরাধী এবং বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর পরিবার। সুষ্ঠু পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকা এই জমি দখল করে অবৈধ স্থাপনা এবং কোটি কোটি টাকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে কৃত্যাত সাকা চৌধুরী। অবৈধভাবে দখলকরা এসব সম্পদের দেখাশোনা করতো তার ছোট ভাই সাইফউদ্দিন কাদের চৌধুরী। ২০০৭ সালের ৯ আগস্ট দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশ হয়।

মূলত, ২০০৭ সালে তত্ত্ববধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর, স্থানীয়দের সুপারিশের ভিত্তিতে ৭ আগস্ট বৈদ্যন্তিক এসব জমি উদ্ধার করেন আইনশঙ্খলা বাহিনী। এমনকি সেখানে অভিযান চালিয়ে ৩ প্লাটন পুলিশ এবং ওয়াসার ৭০ জন কর্মীর মাধ্যমে ১৭৩টি অবৈধ স্থাপনা ভেঙে দেন আদালত। প্রতিকৃষ্ণ জমি ৫ থেকে ৮ লাখ টাকা করে ধরলেও, তৎকালীন সাকা চৌধুরী পরিবার কর্তৃক দখলকৃত এই ভূমির দাম ছিল ৫০০ কোটি টাকা। উদ্ধারের পর সেখানে লাল পতাকা উড়িয়ে দিয়ে, নিরাপত্তার জন্য একটি আনসার ক্যাম্প স্থাপন করা হয়।

এদিকে বিএনপি-জামায়াত জোটের করা ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার তালিকা ধরা পড়ে তত্ত্ববধায়ক সরকারের সময়। ভোটার তালিকা জালিয়াতিতেও পাওয়া যায় সাকা চৌধুরীর নাম। দেখা যায়, সম্পূর্ণ অসাংবিধানিকভাবে রাউজান ও রাঙুনিয়া দুই জায়গা থেকে ভোটায় হয়েছে এই সাকা। এছাড়াও অবৈধপথে আয় করা হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করার অপরাধে দুর্বোধি দমন কর্মশন তখন আটক করে তাকে।

প্রবর্তীতে যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠিত হলে, প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়- মুক্তিযুদ্ধের সময় চট্টগ্রামে গণহত্যার মাস্টারমাইন্ড এবং খুন ও ধর্ষণের ক্ষেত্রে পাকিস্তানি সেনাদের প্রধান সহযোগী ছিল এই সাকা চৌধুরী। পাকিস্তানের কাছে এদেশের রাস্তাঘাট অচেনা থাকায়, সাকা চৌধুরী নিজে তাদের প্রদর্শক হিসেবে ভূমিকা রাখতো। এমনকি তার 'গুডস হিল'-এর বাসায় নিয়মিত আসর বসাতো পাকিস্তানি সেনারা। মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের সদস্যদের ধরে এনে নির্যাতন করা হতো ওই বাসার এর উচ্চারণ সেল-এ।

চট্টগ্রামে টানা পাঁচ দিন অবস্থান করে শত শত মানুষের সাক্ষ্য নিয়ে এসব তথ্য-প্রমাণ পায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত দল। তদন্ত দলের সদস্য এসপি নুরুল ইসলাম জানান, ১৯৭১ সালে চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণহত্যা, ধর্ষণ ও লুটপাটে সাকা চৌধুরীর ভূমিকা ছিল গভীর। সেসব স্মৃতিচারণ করে সাধারণ মানুষ এখনো ভীত হয়ে ওঠে। ২০১২ সালের ২২ জানুয়ারি যুগান্তর পত্রিকার সংবাদে জানা যায়, মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্ত এবং নির্যাতনের শিকার যেসব পরিবার আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ জানিয়েছে, সাকা চৌধুরী তাদের ওপর সন্ত্রাসী বাহিনী লেলিয়ে দেয়। শিবির ক্যাডারদের সহায়তায় মামলার বাদীদের হত্যার হুমকি দিয়ে নির্যাতন চালায় সাকা চৌধুরীর কুখ্যাত পুত্র হুম্মাম কাদের চৌধুরী।

সাকার বিরুদ্ধে করা রাষ্ট্রদ্বোধ মামলার বাদী আবু তাহের এ ব্যাপারে সাকা চৌধুরী, হুম্মাম কাদের চৌধুরী, ফাইয়াজ চৌধুরী এবং নগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ড. শাহাদতের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর বেপরোয়া হয়ে রাজাকার সাকা চৌধুরীর পক্ষ নিয়ে পুলিশের ওপর হামরা করে হুম্মাম কাদেরসহ বিএনপির জামায়াতপত্তী নেতাকর্মীরা। এদের হামলায় আহত হয় সিএমপির এসি জেদান আল মুসা। মূলত চট্টগ্রামকে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে সাধারণ মানুষদের জিম্মি করে ফেলেছিল সাকা ও হুম্মাম গং।

২০০৭ সালের ১১ জুন প্রথম আলোর প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বহুবিধ নাশকতায় কাজে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হওয়ায় খালেদা জিয়ার আস্থাভাজন ব্যক্তিতে পরিগত হয় সাকা। একারণে ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি ভুয়া ভোটার তালিকার মাধ্যমে একচেটিয়া নির্বাচনের যে পরিকল্পনা করেছিল বিএনপি-জামায়াত সরকার, তা বাস্তবায়নের জন্য অন্যতম ব্যক্তি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয় তাকে। এমনকি ক্ষমতা ছাড়ার আগে, নির্বাচনের জন্য পাকিস্তান থেকে পাওয়া ১০০ কোটি টাকা রাজাকার সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর কাছেই জমা রাখেন খালেদা। দুর্বোধি ও জঙ্গিবাদের পঞ্চপোষকতার দায়ে তত্ত্ববধায়ক সরকারের যৌথ বাহিনীর কাছে স্বীকারোক্তিতে এই তথ্য জানায় তৎকালীন স্বরাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর।

প্রসঙ্গত, চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাকিস্তানি হানাদারদের পথ প্রদর্শক এবং বাঙালি যুবক, বুদ্ধিজীবী ও সংখ্যালঘুদের গণহত্যার সহযোগী হয়ে ভীতিকর ব্যক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় সাকা চৌধুরী। পাকিস্তানি ঘাতক বাহিনীকে সঙ্গে করে নিয়ে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের নারীদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালাতো এই যুদ্ধাপরাধী। একারণে স্বাধীনতার পর যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং দেশব্রহ্মাদের তালিকায় শীর্ষে ছিল এই পরিবারের সদস্যরা। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারের নির্মমভাবে হত্যার পর স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমানের ছায়ায় আবারো নাশকতায় মেতে ওঠে তারা।

ফলে ২০১০ সালের প্রথমার্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল গঠনের পর, ডিসেম্বরে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আটক করা হয় রাজাকার, খুনি ও ধর্মক সাকা চৌধুরীকে। কিন্তু ২৫ মিলিয়ন ডলারের বিনিময় ইউরোপ-আমেরিকায় লিবিস্ট নিয়োগ করে বাংলাদেশবিরোধী অপপ্রচার চালাতে শুরু করে সে। ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে র্যাব সাকাকে নির্যাতন করেছে বলে দাবি করে তার পেইড এজেন্টরা। কিন্তু ২০১১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি জনকষ্ট পত্রিকার সংবাদে জানা যায়- যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধে পুলিশের হাতে আটকের পর থেকে দুই মাসের বেশি সময় ধরে জেল হেফাজতে আটক ছিল সাকা। এই সময়ে তার সঙ্গে বাংলাদেশের আরও কয়েকজন শীর্ষ যুদ্ধাপরাধীও জেলে একত্রে ছিল। এটি পুরোপুরি পুলিশ, জেল প্রশাসন এবং আদালতের বিষয়। এর সাথে র্যাবের কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না।

উদ্দেশ্যমূলকভাবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে বাধাগ্রস্থ ও বিতর্কিত করতে ইউরোপ-আমেরিকাতে চিঠি লিখে নানাবিধ নির্যাতনের কথা বলে অপপ্রচার ছড়ায় সাকা চৌধুরী। এই কুখ্যাত রাজাকারের চিঠিগুলোকে ব্যবহার করে তার বিদেশি লিবিস্টরা বিদেশের পত্রিকাগুলোয় এনিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে। এরপর সেই বানোয়াট ও বিআন্তমূলক সংবাদগুলো ব্রিটিশ, আমেরিকার সরকারের কাছে উপস্থাপন করে। অর্থে কারাবন্দি থাকা অবস্থায় ফেব্রুয়ারি মাসেই সাকা সাংসদের গাড়ি ব্যবহার করে নিজে সংসদ অধিবেশনে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে সরকারকে চিঠি দেয়। এমনকি বন্দিদের রেগুলার মেডিক্যাল চেকাপের সময়ও সে নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ দাবি করে চিকিৎসকদের কাছে চেকাপ করাতেও অস্বীকার করে।

পরবর্তী সময়ে অধিকাংশ বিদেশি গণমাধ্যমের কাছে সাকা চৌধুরীর এই ঘড়্যন্ত ও কুটকৌশল স্পষ্ট হয়ে যায়। তাই তারা খোঁজ-খবর নেওয়ার পর সাকার লিবিস্টদের ফাঁদ এড়িয়ে যায়। কিন্তু ২৫ মিলিয়ন ডলারের চুক্তির আওতায় থাকা কয়েকটি গণমাধ্যম, বাংলাদেশের কয়েকটি বিদেশি এনজিও এবং তাদের পেইড এজেন্টরা, বিএনপি-জামায়াতের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী এবং উগ্রবাদী অংশটি সক্রিয় থাকে; এবং ১৯৭১-এর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে আবারো হত্যার হুমকি দেয়। এমনকি পরবর্তীতে চলন্ত গাড়িতে পেট্রোল মেরে, সংখ্যালঘুদের বাড়িতে আগুন দিয়ে, সরকারি প্রতিষ্ঠানে হামলা করে যুদ্ধাপরাধের বিচারকে বানচালের সর্বোচ্চ অপচেষ্টা করে সাকা চৌধুরীর ছেলে হুমাম কাদের চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন উগ্রবাদী সন্ত্রাসীরা।



বিএনপি-জামায়াত অপশাসন:
জবর-দখল, টেক্নোরবাজি, এবং
সন্ত্রাসের মাধ্যমে ঢাকাকে অঙ্গীর
করে তোলে নাসিরউদ্দিন পিন্টু



পিন্টুর নাম শুনলে - ভয়ে সেই স্থান ছাড়ে চলে যেতো লোকজন, রাজধানীর বুকেও এমন দিন গেছে একসময়। ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত খালেদা জিয়ার শাসনামলের সামাজিক পরিস্থিতি এটাই। বিএনপি নেতা নাসিরউদ্দিন পিন্টুর সন্ত্রাসের কথা বলছি। ঢাকার শীর্ষ সন্ত্রাসীদের সমষ্টিয়ের দায়িত্ব দিয়েছিল তাকে তারেক রহমান। হাওয়া ভবনের পক্ষ থেকে সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে রাজধানীর টেক্নো ও ঠিকাদারি নিয়ন্ত্রণ করতো সে। এছাড়াও নিরীহ মানুষের জমি ও বাড়ি দখল, সরকারি নদী দখল, অর্থ পাচার, এসব ছিল তার প্রাত্যক্ষিক ঘটনা। ২০০৭ সালের ১১ অক্টোবর দৈনিক ইন্ডেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকজন শীর্ষ সন্ত্রাসীর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে এসব তথ্য জানা যায়।

২০০৭ সালে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় নিরপেক্ষ তদন্তে পিন্টুর সীমাহীন অপকর্ম ও দুর্নীতির কিছু অংশ তথ্যপ্রমাণসহ প্রকাশ হয়ে পড়ে। জানা যায়, অবৈধ সম্পদ অজনের তালিকায় তারেক ও তার বন্ধু গিয়াস উদ্দিন আল মামুনের সঙ্গে শীর্ষ তালিকায় যারা আছে; তাদের অন্যতম একজন হলো এমপি নাসিরুদ্দিন পিন্টু। ২০০৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর দৈনিক সংবাদ পত্রিকার প্রতিবেদনে জানা যায়, খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমানের সঙ্গে হাওয়া ভবনে সিঙ্গেকেট গড়ে সরকারি ও বেসরকারি খাতে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট করে বিএনপি নেতারা।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও পেশীশক্তি ব্যবহার করে দেশের নদীগুলোর ওপর জবর-দখল চালায় বিএনপি-জামায়াতের শীর্ষ নেতারা। ফলে স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়, নাব্য হাস পায় নদীগুলোর, দীর্ঘমেয়াদের জন্য বিপর্যয় ঘটে দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুর। এই নদী খেকোদের প্রধানতম একজন হলো নাসিরুদ্দিন পিন্টু। ২৫ জানুয়ারি ২০০৭ সালের প্রথম আলো পত্রিকায় ছবিসহ এবিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। প্রতিবেদনে উঠে আসে- ঢাকার বৃড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদীর পাড় ধ্বংসে ৪০ কিলোমিটার এলাকায় জবর-দখল চালানো ক্রচ্ছি হলো- বিএনপির প্রতিমন্ত্রী ইকবাল মাহমুদ টুকু; সংসদ সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদ, নাসিরুদ্দিন পিন্টু, ওয়ার্ড কমিশনার মনোয়ার হোসেন ডিপজল।

পুরান ঢাকার দিকে মিটফোর্ড হসপিটালের পেছনের অংশে নদীতে একক দখল ছিল পিন্টুর। নদী ভরাট এবং শত শত অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করে অবৈধভাবে কোটি কোটি টাকা আয় করে সে। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তাদের বারবার নোটিশ দিলেও কোনো কাজ হয়নি। সরকারের ক্ষমতা দেখিয়ে আরও দ্বিগুণ গতিতে দখল চালিয়েছে।



এমনকি এতিমের সম্পদ দখল করতেও পিছপা হয়নি এই পিন্টুরা। ২০০৭ সালের ১৮ অক্টোবরের দৈনিক ইন্ডিফাক জানায়, সন্ত্রাসী বাহিনীর শক্তি খাটিয়ে ঢাকায় দেড়শ বছরের পুরনো ওয়াকফ করা এতিমখানা দখল করে বিক্রি করে দিয়েছে বিএনপির এমপি নাসিরউল্লিন পিন্টু। সংরক্ষিত নারী আসনের এমপি ও এতিমখানা পরিষদের চেয়ারম্যান সামসুন নাহারের সহযোগিতায় লালবাগের সলিমুল্লাহ এতিমখানার দুই বিঘা জমি বিক্রি করে দেয় সে। এরপর সেই জামিতে একটি ১৬ তলা এবং একটি ২১ তরা ভবন নির্মাণ করে হাউজিং কোম্পানি। এলাকাবাসী বাধা দিলে পিন্টুর নির্দেশে সেখানে আনসার-ক্যাম্প স্থাপন করে নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাওয়া হয়।

বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসকের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রভাবশালী পিন্টুসহ বিএনপি নেতাদের প্রভাবের কারণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও এই অবৈধ দখল এবং ভবন নির্মাণের কাজ থামাতে পারেনি। এই জবর-দখলের বিষয় জানিয়ে তত্ত্ববধায়ক সরকার প্রধান এবং সেনাপ্রধানের হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়।

এছাড়াও, সিএনজি স্টেশন বসানোর নামে রাজধানীর রেলওয়ে, সড়ক ও জনপথ বিভাগের সরকারি জমির দখল নিয়েছিল যেকজন বিএনপি নেতা; তাদের মধ্যে অন্যতম এই পিন্টু। ২০০৭ সালে তত্ত্ববধায়ক সরকারের সময়, ৬ এপ্রিলের জনকঠ এবং ১১ এপ্রিলের প্রথম আলো পত্রিকার সংবাদ থেকে জানা যায়- ২০০৩ সালে এসব জমি বরাদ্দ হয়, নিয়মানুযায়ী ৬ মাসের মধ্যে স্টেশন স্থাপনের কথা থাকলেও ৩ বছরের বেশি সময়েও কিছুই করেনি তারা। ফলে স্টেশনের অভাবে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত গাড়ির লাইন হতে শুরু করে, চরম দুর্ভোগে নিমজ্জিত হয় ঢাকার পরিবহন সেক্টর ও কর্মজীবী মানুষ।

সওজ এবং রেলওয়ে সূত্রে জানা যায়- অনেকে তো জমি নেওয়ার পরেও স্টেশন স্থাপন করেনি, এমনকি ইজারার টাকাও শোধ করেনি। বিএনপি নেতাদেরই আরেকটি সূত্রে জানা যায়- যে নেতারা স্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ নিয়েছেন; তারাই আবার তাদের তাদের ভাই, বেয়াই, বন্ধুদের নামেও একাধিক স্টেশনের মালিকানা ও জমি বরাদ্দ নেয়।

পিন্টুর ইচ্ছার বাইরে কেউ টেন্ডার নিতে গেলে তার পরিণত হতো ভয়াবহ। এমনকি বাণিজ্য মেলা বা কিংবা কোরাবানির পশুর হাটের টেন্ডারেও কেউ অংশ নিতে পারতো না। মন্ত্রণালয় এবং অধিদফতরের বাইরে নিজস্ব বাহিনীর সশস্ত্র পাহাড় বসাতো পিন্টু। শুধু অফিসের কর্মচারী ছাড়া আর কেউ অফিসে প্রবেশ করতে পারতো না। ফলে এককভাবে টেন্ডার পেয়ে যেতো সে। এভাবে পুরান ঢাকায় সালিশ-বৈঠকের নামে নিয়মিত স্বেচ্ছাচারিতা এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে গেছে সে। এমনকি ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় যাওয়ার পরপরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে ছাত্রলিঙ্গ ও অন্যান্য সংগঠনের নেতাকর্মীদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালায় পিন্টুর অনুগত বাহিনী। আজও সেসব কথা মনে পড়লে শিউরে ওঠেন অনেকে



বিএনপি-জামায়াত আমলে ঈদ মানেই চাঁদাবাজি, বাধা দিলেই হত্যা-অপহরণ-অমানবিক নির্যাতন



২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত সরকারের সময় প্রতি ঈদের মধ্যে চাঁদাবাজিকে কেন্দ্র করে প্রায় অর্ধশত মানুষকে হত্যা এবং সহস্রাধিক মানুষকে আহত হতো। ছাত্রদল-শিবিরের সন্ত্রাসীরা সরাসরি প্রকাশ্যে এসব হত্যাকাণ্ডে অংশ নিতো। ২০০৩ সালে কোরবানি ঈদের সময়, এতিমধ্যে শিশুদের জন্য চামড়া সংগ্রহ বিষয়ত বৈঠকে থাকা অবস্থায়, দুই আওয়ামী লীগ নেতাকে মাদ্রাসার ভেতরে গুলি করে হত্যা করে শিবির ক্যাডাররা। এছাড়াও সারা দেশে ঈদের আগের-পরের মোট ৫ দিনে ২৩ জনকে হত্যা করে শিবির-ছাত্রদলের নেতারা।

২০০৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রথম আলো পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশ হয়। জানা যায়, মাদ্রাসায় জঙ্গি কার্যক্রম পরিচালনায় বাধা দেওয়ায় চট্টগ্রাম উত্তর উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-দফতর সম্পাদক ফারুক আহমেদ সিদ্দিকী এবং ব্যবসায়ী সোলাইমান খানকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে শিবির নেতা গিয়াসউদ্দীন গং।

আওয়ামী লীগ নেতা ফারুক সিদ্দিকীর বাবা মাওলানা জাফর আহমেদ সিদ্দিকী হাটহাজারীর জিয়াউল উলুম মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা। ২৩ তারিখ রাতে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ফরিদউদ্দীনের কক্ষে সভা করছিলেন মাদ্রাসা পরিচালনা পর্ষদের ১১ জন। মাদ্রাসার এতিমধ্যে তহবিল সংগ্রহের বিষয়ে আলোচনা চলছিল তখন। কিন্তু এরমধ্যেই শিবিরের সন্ত্রাসীরা সেখানে প্রবেশ করে পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ও প্রতিষ্ঠানের ফারুক ও সোলাইমানকে গুলি করে হত্যা করে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ২০টি গুলির খোসা উদ্ধার করে।

এই ঘটনায় শিবির ক্যাডার গিয়াস হাজারিকা, আইয়ুব আলী রাশেদ, আবদুল মজিদ ও মো. জাভেদকে আসামি করে মালা দায়ের করে। এর আগে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য গিয়াস ও আইয়ুব যৌথ বাহিনীর অভিযানে আটক হয়েছিল। কিন্তু জোট সরকারের প্রভাবশালী এমপি-মন্ত্রীদের সুপারিশে তারা আবার ছাড়া পায় এবং এই বর্বর হত্যাকাণ্ড ঘটায়।

এছাড়াও ঈদের দিন সন্ধ্যায়, নওগাঁর আত্রাইয়ের মদনভাসার বাসিন্দা মুক্তিযোদ্ধা ও আওয়ামী লীগ কর্মী গিয়াসউদ্দীনকে প্রথমে গুলি ও পরে জবাই করে হত্যা করে বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাসীরা। মাস চারেক আগে গিয়াসউদ্দীনের ভাইয়ের বাড়িতেও হামলা চালিয়ে লুটপাট ও মারধর করেছিল জোট সরকারের সন্ত্রাসীরা। এছাড়াও পটুয়াখালী, নাটোর, দিনাজপুর, ভোলা, পিরোজপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ, মুসীগঞ্জ, বাল্দরবান, শেরপুর, বাগেরহাট, খুলনা, বিনাইদহসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ঈদকে কেন্দ্র করে চাঁদাবাজি ও জবরদখল চালায় ছাত্রদল-শিবিরের সন্ত্রাসীরা। কেউ তাদের বাধা দিলেই তাদের গুলি করে অথবা জবাই করে হত্যা করে তারা।

তারেক জিয়া

বিএনপি-জামায়াত
আমলে বিদ্যুৎ খাত: এক
মন্ত্রীর লুটের বিরুদ্ধে
অন্য মন্ত্রীর অভিযোগ,
দূর্নীতির কেন্দ্রে
তারেকের খাম্বা লিমিটেড



২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত সরকারের সময় প্রতি ঈদের মধ্যে চাঁদাবাজিকে কেন্দ্র করে প্রায় অর্ধশত মানুষকে হত্যা এবং সহস্রাধিক মানুষকে আহত হতো। ছাত্রদল-শিবিরের সন্ত্রাসীরা সরাসরি প্রকাশ্যে এসব হতাকাণ্ডে অংশ নিতো। ২০০৩ সালে কোরবানি ঈদের সময়, এতিমধ্যে শিশুদের জন্য চামড়া সংগ্রহ বিষয়ত বৈঠকে থাকা অবস্থায়, দুই আওয়ামী লীগ নেতাকে মাদ্রাসার ভেতরে গুলি করে হত্যা করে শিবির ক্যাডাররা। এছাড়াও সারা দেশে ঈদের আগের-পরের মোট ৫ দিনে ২৩ জনকে হত্যা করে শিবির-ছাত্রদলের নেতারা।

২০০৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রথম আলো পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশ হয়। জানা যায়, মাদ্রাসায় জঙ্গি কার্যক্রম পরিচালনায় বাধা দেওয়ায় চৃত্রগ্রাম উত্তর উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-দফতর সম্পাদক ফারুক আহমেদ সিদ্দিকী এবং ব্যবসায়ী সোলাইমান খানকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে শিবির নেতা গিয়াসউদ্দীন গং।

আওয়ামী লীগ নেতা ফারুক সিদ্দিকীর বাবা মাওলানা জাফর আহমেদ সিদ্দিকী হাটহাজারীর জিয়াউল উলুম মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা। ২৩ তারিখ রাতে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ফরিদউদ্দীনের কক্ষে সভা করছিলেন মাদ্রাসা পরিচালনা পর্ষদের ১১ জন। মাদ্রাসার এতিমধ্যে তহবিল সংগ্রহের বিষয়ে আলোচনা চলছিল তখন। কিন্তু এরমধ্যেই শিবিরের সন্ত্রাসীরা সেখানে প্রবেশ করে পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ও প্রঠপোষক ফারুক ও সোলাইমানকে গুলি করে হত্যা করে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ২০টি গুলির খোসা উদ্বার করে।

এই ঘটনায় শিবির ক্যাডার গিয়াস হাজারিকা, আইয়ুব আলী রাশেদ, আবদুল মজিদ ও মো. জাভেদকে আসামি করে মামলা দায়ের করে। এর আগে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য গিয়াস ও আইয়ুব মৌখিক বাহিনীর অভিযানে আটক হয়েছিল। কিন্তু জোট সরকারের প্রতাবশালী এমপি-মন্ত্রীদের সুপারিশে তারা আবার ছাড়া পায় এবং এই বর্বর হত্যাকাণ্ড ঘটায়।

এছাড়াও ঈদের দিন সন্ধ্যায়, নওগাঁর আত্মাইয়ের মদনতাঙ্গার বাসিন্দা মুক্তিযোদ্ধা ও আওয়ামী লীগ কর্মী গিয়াসউদ্দীনকে প্রথমে গুলি ও পরে জবাই করে হত্যা করে বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাসীরা। মাস চারেক আগে গিয়াসউদ্দীনের ভাইয়ের বাড়িতেও হামলা চালিয়ে লুটপাট ও মারধর করেছিল জোট সরকারের সন্ত্রাসীরা। এছাড়াও পটুয়াখালী, নাটোর, দিনাজপুর, ভোলা, পিরোজপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ, মুলীগঞ্জ, বান্দরবান, শেরপুর, বাগেরহাট, খুলনা, বিনাইদহসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ঈদকে কেন্দ্র করে চাঁদাবাজি ও জবরদস্থল চালায় ছাত্রদল-শিবিরের সন্ত্রাসীরা। কেউ তাদের বাধা দিলেই তাদের গুলি করে অথবা জবাই করে হত্যা করে তারা।

৫ দেশের আ্যাকাউন্টে
কয়েক হাজার কোটি
টাকা পাচার করে
তারেক রহমান



২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময়, খালেদা জিয়ার ছেলে তারেক রহমান হাওয়া ভবন থেকে একটি বিকল্প সরকার পরিচালনা করতো। মূল সরকারের অনেক মন্ত্রী-এমপির চাইতেও প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল তারেক রহমানের সেই হাওয়া ভবন সিভিকেট। এরপর ৫ বছরে ব্যাপক দুর্নীতি, টেন্ডারবাজি, খাস জমি দখল, চাঁদাবাজির ভাগ, বিদ্যুৎ খাতে লুটপাট এবং সরকারের উন্নয়ণ প্রকল্পের কয়েক হাজার কোটি টাকা আত্মসাঙ্ক করে তারেক রহমান। সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় তারেকের এসব অপর্কর্ম ফাঁস হয়ে পড়ে।

১২ মার্চ ২০০৭ সালের যুগান্তর পত্রিকায় তারেক রহমানের স্বীকারোভিল বরাত দিয়ে হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচারের সংবাদ প্রকাশ হয়েছে। যৌথ বাহিনীর জিভাসাবাদের মুখে তারেক রহমান জানায়- মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, দুবাই এবং সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকে এসব অর্থ রেখেছে সে।

তারেক স্বীকারোভিলতে জানায়- ২০০১ সালের অক্টোবরের নির্বাচন এবং ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি যে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল, সেটার জন্য মনোনয়ন বাবদ দলীয় নেতাদের কাছ থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকা অনুদান পাওয়া গেছে। কিন্তু দলীয় নেতাদের সূত্র থেকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জানায়, এসব টাকা অনুদান নয় বরং চাঁদী হিসেবে আদায় করেছিল তারেক রহমান। হাওয়া ভবন সিভিকেটে এই টাকা না দিলে দলীয় মনোনয়ন পাওয়া সম্ভব ছিল না। এসব টাকা হ্রস্বির মাধ্যমে বিদেশে পাচার করে তারেক।

এসময় যৌথ বাহিনীর জিভাসাবাদে ৩০ জন বিএনপি নেতার নাম বলেছে তারেক রহমান, যারা তার হয়ে দলীয় মনোনয়ন ও পদ-বাণিজ্যের বিষয়গুলো দেখাশোনা করতো। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- মির্জা আব্রাস, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, আমানউল্লাহ আমান, গিয়াসউদ্দিন আল মামুন, সালাহউদ্দিন আহমেদ, মোয়াজেম হোসেন আলাল।

এদিকে, মালয়েশিয়া সরকার তারেক রহমানের ২৩০ মিলিয়ন ডলার তথা ১ হাজার ৭২৫ কোটি টাকা জরুর করে ওইসময়। দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৫ মিলিয়ন ডলার প্রজেক্টেও তারেক রহমানের বেশ কয়েকটি বিনিয়োগের তথ্য জানা যায়। এসব দুর্নীতির তথ্য আন্তর্জাতিকভাবেও বেশ আলোচিত হয়ে ওঠে তখন।

এছাড়াও ২০০৭ সালের ১০ মার্চ উদয় টাওয়ারের মালিক আমিন আহমেদ ভূইয়ার মুখোমুখি করা হয় তারেক রহমানকে। সেসময় তারেক রহমান স্বীকার করে জানায়, সে ১ কোটি টাকা চাঁদী হিসেবে নিয়েছিল আমিন আহমেদের কাছ থেকে। এছাড়াও দেশের বড় বড় ঠিকাদারদের কাছ থেকে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন সময় ঘোটা অংকের টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করে তারেক। এরমধ্যে গিয়াসউদ্দিন আল মামুনের কয়েকটি ভিডিও দেখানো হয় তারেককে। এরপর বিভিন্ন দেশে হ্রস্বির মাধ্যমে টাকা পাঠানোর কথা স্বীকার করে সে।

**২০০১ থেকে ২০০৬:
সমুদ্র সৈকতের ১০০
একর জমি দখল করে
খালেদা জিয়া ও তারেক
রহমানের আত্মীয় ও
ঘনিষ্ঠ বিএনপি নেতারা**



বিএনপি-জামায়াত শাসনামলে খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় গণপৰ্ত মন্ত্রণালয় থেকে তার ঘনিষ্ঠদের পানির দামে প্লট দিয়ে সরকারের হাজার কোটি টাকা লুটপাট করেন। এমনকি তার আত্মীয়-স্বজন এবং কাছের বিএনপি নেতাদের চাহিদামতো কর্তৃবাজার সমুদ্র সৈকতের পাশে ১০০ একর সরকারি জমি দখল করার ব্যবস্থাও করে দেন তিনি। প্লট বরাদ্দের নামে শত একরের এই জায়গা ভাগ বাটোয়ারা করে নেয় খালেদা জিয়ার ও তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা।

সৈকতের জমি দখলকারী ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম হলো- খালেদা জিয়ার ভাই ও বিএনপি নেতা সাঈদ এঙ্কান্দার, তারেক রহমানের আত্মীয় সালাহ উদ্দিন আহমেদ, বিমান মন্ত্রী মীর নাসির, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোরশেদ খানের ছেলে ফয়সাল খান; তারেক রহমানের বন্ধু মামুনের ভাই এমপি হাফিজ ইব্রাহিম, ইকোনো বলপেনের মালিক এমপি কাজী সালিমুল হক, বাবুল গাজী, আশরাফ হোসেন, হাবীবুন নবী খান সোহেল প্রমুখ প্রতাবশালী বিএনপি নেতারা।

২০০৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রথম আলোর প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, হোটেল মোটেল তৈরির নামে ১০০টি প্লট করার কথা বলে সমুদ্রসৈকতের ১০০ একর জমি দখল করে সৈকতের পরিবেশ নষ্ট করে এই বিএনপি নেতারা। বরাদ্দ নেওয়ার পর অবৈধভাবে অধিকাংশই চড়া দামে এসব জমি বিক্রি করে দিয়ে কোটি কোটি টাকার মালিক হন। খালেদা জিয়ার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও তৎকালীন যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী সালাহ উদ্দিন আহমেদ, তারেক রহমানের সহযোগিতায় এবং ভূমি উপমন্ত্রী রুহুল কুন্দুস তালুকদার দলুর সহায়তায়, ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে সমুদ্রের পরিবেশ সংকটাপন্ন এলাকায় অবৈধভাবে এসব জমি বরাদ্দের বন্দোবস্ত করেন।

স্থানীয় বিএনপি নেতারা জানান, তাদের অনেকের নামেই প্লট বরাদ্দ নিয়েছিলেন সাবেক মন্ত্রী সালাহ উদ্দিন আহমেদ। কিন্তু তারা শুধু স্বাক্ষর করা ছাড়া আর কিছুই করেননি। হাওয়া ভবনের কথা বলে এসব প্লট তাদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়ে প্রতি প্লট তিন থেকে চার কোটি করে বিক্রি করেছেন সালাহ উদ্দিন। এমনকি তাদের কোনো টাকা পয়সাও দেওয়া হয়নি।

ব্যবসায়ীরা জানান, সমুদ্র যেঁমা ১০০ একর জমিতে ১০০টি প্লট দখল করে তারা ওখানে বিএনপি পঞ্জী গড়ে তুলেছে। সরকার যদি ন্যায্যভাবে এসব অবৈধ প্লট পুণরায় ন্যায্যভাবে বরাদ্দ দেয়, তাহলে সরকার হাজার কোটি টাকা রাজস্ব পেতে পারে।

প্রসঙ্গত, এই সালাহ উদ্দিন আহমেদ তারেক রহমানের এতেটাই ঘনিষ্ঠ যে- ঢাকা শহরকে যখন চারভাগে ভাগ করে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের এলাকা নির্ধারণ করে দিয়েছিল তারেক, তখন যে চারজন বিএনপি নেতাকে চার অঞ্চল দেখাশোনার দায়িত্ব দেন সে, তাদের অন্যতম একজন হলো সালাহ উদ্দিন। ফলে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের সহায়তায় ঢাকায় বড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদীর বিস্তীর্ণ এলাকা দখল ও ভরাট করে স্থাপনা নির্মাণের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা অবৈধভাবে আয় করে সালাহ উদ্দিন। এছাড়াও ভূমিউপমন্ত্রী রংহুল কুন্দুস তালুকদার দুলুর মাধ্যমে নাটোর-পাবনা-রাজশাহীসহ উত্তরাঞ্চলে বাংলাভাই এবং উগ্রবাদী জঙ্গিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতো তারেক। সরাসরি সরকারের মদত থাকায় বাংলা ভাইয়ের মতো খুনি জঙ্গিদের সাথে প্রাকশ্যে নিজ বাসভবনে বৈঠক এবং তাদের মধ্যে অর্থ বিতরণ করতেন এই বিএনপি নেতা দুলু।



**২০০১ থেকে ২০০৬:
স্পিরিট উৎপাদনকারী
প্রতিষ্ঠান দখল, প্রতি
মাসে ২ লাখ করে চাঁদা
নিতো তারেক**



২০০১ সালের অক্টোবরে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার গঠনের পরপরই রাজধানীর মার্শাল ডিস্টিলারিজ নামের একটি রেকটিফারেড স্পিরিট কোম্পানি দখলে নেয় তারেক রহমান। এরপর ২০০২ সালের মার্চ মাস থেকে প্রতিমাসে দুই লাখ টাকা হারে চাঁদা নিতো। এমনকি তারেকের ড্রাইভার মিজানের বেতনের টাকাও পরিশোধ করতে হতো মার্শাল ডিস্টিলারির প্রকৃত মালিক হারুন ফেরদৌসীকে। এছাড়াও ২০০৫ সালে রেজা কল্পট্রাকশানের কাছে সড়ক উন্নয়ন কাজের বরাদ্দ থেকে ১০ শতাংশ টাকা আদায় করে তারেক। হাওয়া ভবনের নির্দেশে ঢাকার শীর্ষ সন্তাসীদের হাতে প্রাণ হারানোর ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করেনি তখন।

কিন্তু জোট সরকারের পতনের পর, ২০০৭ সালে সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় খালেদ জিয়ার ছেলে তারেক রহমান, তার বন্ধু গিয়াসউদ্দিন আল মামুন এবং বিএনপি সরকারের এমপি খায়রুল কবির খোকনের নামে চাঁদাবাজির মামলা করে ভুক্তভোগীরা। ২০০৭ সালের ২৯ মার্চ প্রথম আলো পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশ হয়।

মার্শাল ডিস্টিলারিজের মালিক হারুন ফেরদৌসী জানান, ২০০১ সালের শেষের দিকে তারেক রহমান ও তার বন্ধু তাকে বনানীর রহমান নেভিগেশনের কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে যায়। তার অফিসকে কাকরাইল থেকে শিফট করে সেখানে স্থাপন করতে বলে। ২০০২ সালের ২ মার্চ তারেকের উপস্থিতিতে মামুন তাকে ডেকে নিয়ে তাদের দুজনের প্রত্যেককে প্রতিমাসে এক লাখ টাকা করে দিতে বলে। নাহলে প্রতিষ্ঠান বক্সের ভূমকি দেয়। এরপর বাবুলের মাধ্যমে ২০০৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিমাসে টাকা দেওয়া হয়। এভাবে তারেককে ৪৬ লাখ ও মামুনকে ৩৫ লাখ টাকা দিয়েছেন বলে অভিযোগপত্রে জানান তিনি।

এদিকে গুলশানের ব্যবসায়ী ও রেজা কল্পট্রাকশানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আফতাবউদ্দিন তার অভিযোগে জানান, তার প্রতিষ্ঠানটি এমবিইএল নামের আরেকটি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার সড়ক উন্নয়নের জন্য ১৮ কোটি ৫৭ লাখ টাকার কাজ পায়। কার্যাদেশ পাওয়ার পরের দিন, ২০০৫ সালের ২৪ জুন গিয়াসউদ্দিন আল মামুন তাকে ফোন করে ১০ শতাংশ টাকা দাবি করে। ২৫ জুন এমপি খায়রুল কবির খোকন তাকে চেকবইসহ গুলশানে সিলভার টাওয়ারে মামুনের অফিসে যেতে বলে। সেখানে গিয়ে এক কোটি ৩২ লাখ টাকার চেক দেন তিনি। পরের দিন সেই টাকা তোলা হয়। এরপর খায়রুল কবির খোকন ও তারেকের সহযোগী (এপিএস) মুরগিদ্দিন অপু আবারো ২০ লাখ টাকা চেয়ে প্রাণের ভূমকি দেয়, বাধ্য হয়ে আবারো ১৬ লাখ টাকা দেন তিনি।

বিএনপি-জামায়াত জোটের চাঁদাবাজি: চেকে নয়, ব্যাগভর্তি ক্যাশ নিতে পছন্দ করতো তারেক

২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সরকারে থাকার সময় দেশজুড়ে কমিশন বাণিজ্য ও চাঁদাবাজি করে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার করে খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমান। ঢাকা শহরের ঠিকাদার ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যেকোনো কাজের জন্য কমপক্ষে ১০ শতাংশ কমিশন নিতো সে। চাঁদাবাজির ক্ষেত্রে এই বিএনপি নেতাকে সহযোগিতা করতো বিতর্কিত ব্যবসায়ী গিয়াসউদ্দিন আল মামুন, এমপি খায়রুল কবির কোকন ও তার তথাকথিত এপিএস নুরুদ্দিন অপু।

২০০৭ সালের ১৯ মার্চ প্রথম আলো পত্রিকার সংবাদে জানা যায়, গুলশানের উদয় টাওয়ারের মালিক ও ঠিকাদার আমীন আহমেদ ভুইয়ার কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে এক কোটি টাকা চাঁদা নিয়েছে তারেক রহমান। পরে অবশ্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে তারেক এটা শিকারও করে। কিন্তু এটাকে চাঁদা হিসেবে নেয়নি, বরং এমনি নিয়েছে বলেও দাবি করেছিল তারেক।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পর গুলশান থানায় দায়ের করা এসংক্রান্ত মামলার অভিযোগপত্র থেকে জানা যায়, মামলার বাদী আমীন আহমেদ একটি সড়কের ঠিকাদারির কাজ করছিলেন। এই তথ্য জানার পর তারেক রহমান তার লোকের মাধ্যমে বনানীর অফিসে ডেকে নিয়ে যায় তাকে। চাঁদা না দিলে ভয়াবহ পরিস্থিতের মুখে ফেলার হুমকি দেয়। এরপর ভয়ে ২০০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর বন্ধু হাইকো সাথে নিয়ে হাওয়া ভবনে গিয়ে এক কোটি টাকার চেক দেন তিনি। কিন্তু চেক নিতে অস্বীকার করে তারেক রহমান। এরপর বাধ্য হয়ে ৪ জানুয়ারি দুটি ব্যাগে ভরে এক কোটি টাকা নিয়ে হাওয়া ভবনে ঘান তিনি। তারেকের সহযোগী অপু ব্যাগ দুটি ভেতরে নিয়ে যায়। এরপর তারেক তাকে ফোন দিয়ে টাকা পাওয়ার কথা নিশ্চিত করে।

খালেদা জিয়ার শাসনামল:
পাচার করা দুই হাজার কোটি
টাকা ইউরোপ, মালয়েশিয়া ও
সিঙ্গাপুরে বিনিয়োগ করে
তারেক রহমান



২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের পাঁচ বছরে কমিশন বাণিজ্য, চাঁদাবাজি, দুর্নীতির মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হয় তারেক রহমান। এসব অর্থ তার ব্যবসায়িক বন্ধু গিয়াসউদ্দিন আল মামুনের মাধ্যমে বিদেশে পাঠানো হয়। এমনকি বিদেশে থাকা পাঁচটি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ইউরোপের কয়েকটি দেশ, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে এই পাচার করা অর্থের একটা অংশ বিনিয়োগ করে তারা। তত্ত্ববধায়ক সরকারের সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে আটক তারেক রহমান জানায়- বিদেশে টাকা পাঠানো এবং বিনিয়োগের ব্যাপারগুলো মামুন ও সিলভার সেলিম দেখাশোনা করতো। দেশের ব্যবসাগুলো দেখতো তার ভাই আরাফাত রহমান কোকো, বন্ধু মামুন এবং মামা সাঈদ ইক্বান্দার।

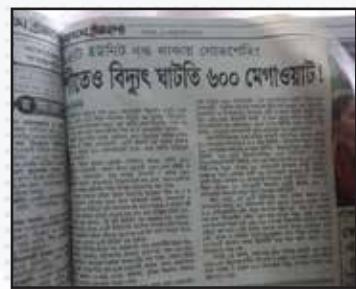
২০০৭ সালের ১২ মার্চ যুগান্তর, ১৩ মার্চ দৈনিক দিনকাল, ১৪ মার্চ ও ২২ মার্চ ভোরের কাগজ এবং ১৫ মার্চ ইতেফাক পত্রিকায় এসব সংবাদ প্রকাশ হয়।

জানা যায়, যৌথ বাহিনীর কাছে প্রথমে সব অভিযোগ অস্বীকার করেছিল তারেক রহমান। কিন্তু তার বন্ধু তাদের মামুন অর্থ উপার্জনের সোর্স এবং বিদেশের পাঠানো অর্থের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি দেয়। এরপর সেই ভিডিও দেখানো হয় তারেক রহমানকে। এরপর ভেঙে পড়ে সে এবং নিজেও এসব বিষয়ে কথা বলে। এমনকি পাঁচটি বিদেশি ব্যাংকে তার নিজের নামে থাকা অ্যাকাউন্টগুলো সম্পর্কেও তথ্য দেয় তারেক। ইউরোপ, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরসহ কয়েকটি কয়েকটি দেশে তার বিনিয়োগ আছে বলেও স্বীকার করে।

বিজ্ঞাপনী ব্যবসার মাধ্যমে প্রচুর টাকা উপার্জনের কথা জানায় তারেক। সে আরও জানায় যে, বিজ্ঞাপনী ব্যবসা থেকে সে টাকা পেরেও এটি মূলত কোকো দেখতো। প্রভাব খাটিয়ে বড় বড় বিজ্ঞাপনের কাজগুলো হাতিয়ে নিতো। এমনকি কোনো বিদেশি বিজ্ঞাপনী কোম্পানি কাজ পেরেও তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতো তারেকের হাওয়া ভবন চক্র। কমিশন না দিয়ে কেউ ব্যবসা করতে পারেনি জোট সরকারের পাঁচ বছর। অ্যাড ফার্মের নামে সরকারি ও বেসরকারি বিজ্ঞাপনী ব্যবসা থেকে কয়েকগুণ বেশি দরে টাকা আদায় করতো কোকো। বিটিভির পিক আওয়ারের চাক্ষ ও বিলবোর্ড ব্যবসার নামেও কোটি টাকা হারিলুট করে খালেদা জিয়ার পরিবারের সদস্যরা।

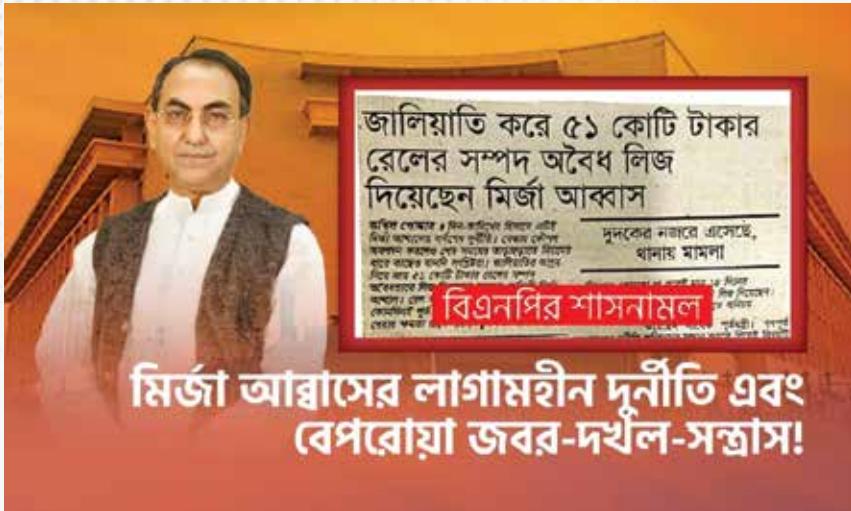
তত্ত্ববধায়ক সরকারের সময় বিদেশে তারেক রহমানের পাচার করা দুই হাজার কোটি টাকার সন্ধান পায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তদন্তকারী দল। এরপর সেই অর্থ ফেরানোর জন্য জাতিসংঘের সহযোগিতা চায় তারা। একটি চাঁদাবাজির মামলায় তারেক রহমান ও তার বন্ধু মামুনকে মুখোমুখি জিজ্ঞাসাবাদও করে গোয়েন্দারা। এরপর মামুনকে সঙ্গে নিয়ে সুইজারল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও ইউরোপের একটি দেশে গিয়ে সেখানকার ব্যাংক থেকে তারেকের কোটি কোটি টাকার খোঁজ নেয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এরপর তারেক ও মামুনের দেওয়া বক্তব্য অনুসারে, তারেক রহমানের দুই হাজার কোটি টাকার সম্পদের সন্ধান পায় তদন্ত দল।

তদন্ত দল জানায়- দক্ষিণ আফ্রিকার ১৫ মিলিয়ন প্রজেষ্ঠো বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করেছে তারেক। মালয়েশিয়াতে তার জন্ম হওয়া ২৩০ মিলিয়ন ডলারের ব্যাপারেও কথা হয়েছে তার সাথে। এমনকি বিমান, যোগাযোগ, সিএনজি, বিদ্যুৎ সেস্টর থেকেও প্রচুর টাকা কমিশন নিয়েছে সে। ঢাকার ঠিকাদারি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত এক ব্যবসায়ীর মুখোয়াখি করা হলে তার কাছ থেকে এক কোটি টাকা নেওয়ার তথ্যও স্বীকার করে তারেক রহমান। সে আরো জানায়- ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে যে নিবাচন হওয়ার কথা ছিল, স্টোকে কেন্দ্র করে মনোনয়ন বাবদও অনেক টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল। হাওয়া ভবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ৩০ জন মন্ত্রী-এমপি ও নেতার মাধ্যমে সারাদেশের কমিটি বাণিজ্য থেকেও কোটি কোটি টাকা পেয়েছে তারেক।



মির্জা আকবাস

বিএনপির শাসনামল: মির্জা আকবাসের লাগামহীন দুর্নীতি এবং বেপরোয়া
জবর-দখল-সন্ত্রাস



মির্জা আকবাসের লাগামহীন দুর্নীতি এবং বেপরোয়া জবর-দখল-সন্ত্রাস!

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের শেষের দিকে, টেঙ্গার ছাড়াই সম্পূর্ণ অবৈধভাবে রেলওয়ের ২ একর জমি একটি কাণ্ডজে প্রতিষ্ঠানকে লিজ দেয় গণপৃত মন্ত্রী মির্জা আকবাস। এই সম্পদের মূল্যের পরিমাণ ছিল তখন কমপক্ষে ৫১ কোটি টাকা। হাওয়া ভবনের নির্দেশে মাত্র ১৪ দিনের মধ্যে এর পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ এই বিএনপি নেতা। অথচ রেলওয়ের জমি গণপৃত মন্ত্রণালয়ের অধীনেই নয়, এটি করার আইনগত অধিকার তার নাই।

এমনকি যে সমিতির নামে জমিটি ৯৯ বছরের জন্য লিজ দেওয়া হয়েছে, সেই সমিতির নামও সমবায় অফিসের তালিকায় খুঁজে পাওয়া যায়নি। ২০০৭ সালের ২৮ জুলাই দৈনিক জনকঠ পত্রিকার সংবাদে এসব তথ্য প্রকাশ করা হয়। তত্ত্ববধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর রেলওয়ের পক্ষ থেকে তাদের জমির ন্যায় দখল ফিরে পাওয়ার দাবি জানালে, বিষয়টি দুর্নীতি দমন করিশনের নজরে আসে।

জানা যায়, ২০০৬ সালের অক্টোবরে বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতা ছাড়ার আগে এটাই মির্জা আকবাসের শেষ দুর্নীতি। মাত্র ১৪ দিনের মধ্যে পূর্বাচল সমবায় সমিতির নামক একটি কাণ্ডজে প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ১ কোটি ৪৬ লাখ টাকা ক্যাশ জমা নিয়ে জমির দখল বুঝিয়ে দেওয়া হয়। রেলওয়ের মালিকানাধীন ওই জমির একটি অংশে, রেলওয়ের অনুমোদক্রমে একটি প্রতিষ্ঠান লিজ নিয়ে ব্যবসা করছিল, পেশী শক্তি খাতিয়ে তাদেরও সেখান থেকে ভাগিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় রেলওয়ে প্রতিবাদ জানালেও মির্জা আকবাসের ক্যাডার বাহিনীর প্রতাপের কাছে হেবে যায় তারা।

বিএনপি আমলে এভাবেই সন্ত্রাসীদের ক্ষমতার দাপটে নিয়মনীতির তোয়াক্তা করা হয়নি কোথাও। এমনকি সরকারি কর্মচারীদেরও হৃষকি-ধামকি ও সন্ত্রাসী আচরণ চালিয়ে গেছে বিএনপি-জামায়াতের এমপি-মন্ত্রীরা। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এ বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার ভাই-ভাঙ্গেসহ অন্যান্য স্বজন এবং মোসাদ্দেক আলী ফালুর নামেও রাষ্ট্রের ৮০০ কোটি টাকার জমি জালিয়াতি করে দলিল করে দিয়েছিল এই আকবাস। এমনকি তারেক রহমানের হয়ে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতো ঢাকার যে চারজন এমপি, আকবাস তাদের মধ্যেও অন্যত্ম।

বিএনপি-জামায়াতের সরকারি সম্পদ লুট: রেলের ১০০ কোটি টাকা মূল্যের জমি ৫ কোটিতে বিক্রি করে মির্জা আবাস

২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সরকারে থাকার সময় জনগণের সম্পদের ওপর সীমাহীন লুটপাট চালায় বিএনপি-জামায়াত নেতারা। খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের পছন্দের ব্যক্তিদের কাছে নামমূল্যে সরকারের শত কোটি টাকার জমি বরাদ্দ দেয় পূর্তমন্ত্রী মির্জা আবাস। এমনকি কোটি কোটি টাকা দুর্নীতির বিনিময়ে রেলের ৭৮ কোটি টাকা মূল্যের জমি মাত্র ৫ কোটিতে বিক্রি করে দেন এই বিএনপি নেতা।

২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর, বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো এসব দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ১৯ মার্চ জনকগঠের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সরকারের শেষের দিকে এসে শাহজাহানপুরে রেলওয়ের ১৩ একর জমি প্লট আকারে বিক্রি করে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। মন্ত্রী মির্জা আবাস নিজের স্বজন ও দলীয় লোকদের কাছে এই জমি বরাদ্দ দেন।

জানা যায়, ২০০৬ সালে ঢাকার শাহজাহানপুর এলাকায় জমির দাম ছিল ৩০ থেকে ৪০ লাখ টাকা কাঠা। অথচ প্রতি বিঘা জমি মাত্র ৪০ লাখ টাকা দরে বিক্রি করে দেওয়া হয় মির্জা আবাসের নির্দেশে। সেই হিসেবে ১৩ বিঘা জমি বিক্রি হয়েছে মাত্র ৫ কোটি ২০ লাখ টাকায়। অথচ বাজারদর অনুসারে এই জমির দাম ছিল তখন ৭৮ কোটি টাকা। কমপক্ষে ৭৩ কোটি টাকা কমে জমি বিক্রি করে বিপুল অঙ্কের অর্থ লুটপাট করে মির্জা আবাস।



বিএনপি-জামায়াত দুঃশাসন: সরকারি ভূমি দখল, নিয়োগ বাণিজ্য, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির হোতা হয়ে ওঠে মির্জা আবাস



২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াতের শাসনামলে ঢাকার শীর্ষ সন্ত্রাসীদের অন্যতম গড়ফাদার ছিল বিএনপি নেতা মির্জা আবাস। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হওয়ায় একই সাথে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং হাওয়া ভবনের নানাবিধি অপকর্মের ক্রীড়নক হয়ে ওঠে সে। মোস্ট ওয়ান্টেড সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে টেক্ডার নিয়ন্ত্রণ, ভূমি দস্যুতা ও চাঁদাবাজির সিঙ্কিকেট গড়ে ঢাকাকে পরিণত করে ফ্রাইম সিটিতে। তাদের সীমাইন দুর্নীতি ও অপকর্মের কারণে এসময় পাচবার দুর্নীতিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ।

২০০১ সালের ২০ অক্টোবর, সরকার গঠনের পরপরই কারাগারে বন্দি থাকা দেশের শীর্ষ সন্ত্রাসীদের মুক্তি দিতে শুরু করে বিএনপি-জামায়াত সরকার। তারেক রহমানের গ্রিন সিগন্যাল অনুসারে, তালিকা ধরে ধরে সিরিয়াল কিলারদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ঢাকাকে চারভাগ করে চার এমপিকে দেওয়া হয় সন্ত্রাসীদের দেখভালের দায়িত্ব। ঢাকার টেক্ডারবাজি নিয়ন্ত্রণ করতে তারেক রহমানের হয়ে সুব্রত সাইন, আরমান, সাগর, তাজসহ কুখ্যাত এই সন্ত্রাসীদের তত্ত্বাবধান করতো যারা, তাদের মধ্যে অন্যতম হল মির্জা আবাস।

২০০৭ সালের ১১ অক্টোবর দৈনিক ইন্ডিফাক পত্রিকা থেকে জানা যায়, ২০০১ সালে নির্বাচনের আগে তেজগাঁও ছাত্রদলের এজিএস ইমাম ও লম্বু সেলিমের মাধ্যমে হাওয়া ভবনের সঙ্গে যোগাযোগ হয় শীর্ষ সন্ত্রাসী কালা জাহাঙ্গীরের। সেসময় নির্বাচনে জিততে যা কিছু করার, সব করার জন্য কালা জাহাঙ্গীরকে অনুরোধ করে তারেক রহমান। বিনিময়ে পরবর্তীতে কালা জাহাঙ্গীরের গ্রন্থকে সর্বোচ্চ সর্বিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়। এমনকি শীর্ষ সন্ত্রাসী টোকাই সাগরকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে মহানগর বিএনপির বুঝ সম্পাদকের পদ দেওয়া হয় তারেকের নির্দেশে।

এমনকি বিএনপি-জামায়াত জোট শাসনামলের পাঁচ বছরে শুধু গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকেই হাজার কোটি টাকার সম্পদ লটপাট করে স্বজনদের জন্য বরাদ্দ করান স্বয়ং খালেদা জিয়া। তৎকালীন গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী মির্জা আবাসের মাধ্যমে এটি করেন তিনি। ২০০৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারির দৈনিক জনকৃষ্ণ পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়- খালেদা জিয়ার ভাষ্যে শাহরিন ইসলাম তুহিন, তার ভাই নূরুল নেওয়াজ সেলিম, রাজনৈতিক সচিব ও ব্যক্তিগতভাবে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি মোসাদেক আলী ফালু, নূরুল ইসলাম মনি, এ কালাম আজাদ, মো. নাজিমুদ্দিন, সাস্টেন ইক্সিন্ডার, সানজি প্রোপার্টিজ প্রমুখের মধ্যে হাজারকোটি টাকা মূল্যের জমি ও বাড়ি বস্টন করে দেওয়া হয়।

রাজধানীর গুলশান, বনানী, ধানমন্ডি, এলিফ্যান্ট রোড, ইক্সটনে ২৯টি সরকারি বাড়ি ও জমি সিঙ্কিকেট করে পানির দামে বিক্রি করে দেওয়া হয় মির্জা আবাসের নির্দেশে। মোট ৩৯১ কাঠা জামির ওপর তৈরি এসব বাড়ির বাজার দর ছিল ওইসময় ৮০০ কোটি টাকার ওপর। কিন্তু বাজার দরের এক দশমাংশ দামে এসব বাড়ি বিক্রি করেছে রাজউক। গুলশানের দেড় থেকে দুই কোটি কাঠা মূল্যের এসব বাড়ি বিক্রি করা হয়েছে মাত্র ১০ থেকে ১৫ লাখ কাঠা দরে।

২০০৭ সালের ২৮ জুলাই দৈনিক জনকষ্ঠ পত্রিকার আরেকটি সংবাদ থেকে জানা যায়, ২০০৬ সালে টেক্সার ছাড়াই তড়িঘড়ি করে রেলওয়ের ২ একর জমি একটি কাণ্ডে প্রতিষ্ঠানকে মাত্র ১ কোটি ৪৬ লাখ টাকার বিনিময় লিজ দেয় গণপূর্ত মন্ত্রী মির্জা আব্বাস। এই সম্পদের মুল্য ছিল তখন কমপক্ষে ৫১ কোটি টাকা। অর্থাৎ রেলওয়ের জমি গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে নয়, তাই এটি করার আইনগত অধিকার মির্জা আব্বাসের ছিল না। এই ঘটনায় রেলওয়ে প্রতিবাদ জানায়, মির্জা আব্বাসের ক্যাডার বাহিনীর প্রতাপের কাছে হেরে যায় সরকারি প্রতিষ্ঠানটি। খালেদা জিয়ার শাসনামলে এভাবেই সন্ত্রাসীদের ক্ষমতার দাপটে নিয়মনীতির তোয়াক্ত করা হয়নি কোথাও।

এছাড়াও প্রভাব খাটিয়ে সরকারি জমি দখল, পানির দামে কোটি টাকার সরকারি প্লট বিক্রি এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ বাণিজ্য করে অবৈধভাবে শত কোটি টাকার মালিক হয় বিএনপি নেতা আব্বাস। এমনকি তার হরিলুটের নিয়োগ বাণিজ্যে বাধা দিলে, সরকারি কর্মকর্তাদের পোস্টিং করানোটা ছিল তার জন্য এক সেকেন্ডের ব্যাপার।

১৭ জুন ২০০৭ সালের সমকাল পত্রিকা থেকে জানা যায়, ২০০৬ সালের শেষের দিকে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষে ৭১ জনকে দ্রুততার সাথে চাকরি দেয় প্রতিমন্ত্রী আব্বাস। ২০ আগস্ট পত্রিকায় চাকরির বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর, শতাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে ৪ থেকে ৬ লাখ টাকা করে নেওয়া হয়। কিন্তু এই হরিলুটের নিয়োগে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সংস্থার তৎকালীন চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমান। এরপর প্রতিমন্ত্রী আব্বাস তাকে সাভারে প্রশিক্ষণে পাঠানোর নামে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়। এরপর ৬ অক্টোবর একই প্রশ্নে- দুই শিফটে- ভিন্ন ভিন্ন সব পদের পরীক্ষা হয় এবং ২০ অক্টোবর তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়।

এমনকি কোটি কোটি টাকা দুর্নীতির বিনিময়ে রেলের ৭৮ কোটি টাকা মূল্যের জমি মাত্র ৫ কোটিতে বিক্রি করে দেন এই বিএনপি নেতা। ২০০৭ সালের ১৯ মার্চ জনকষ্ঠের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়- সরকারের শেষের দিকে এসে শাহজাহানপুরে রেলওয়ের ১৩ একর জমি প্লট আকারে বিক্রি করে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। মন্ত্রী মির্জা আব্বাস দুর্নীতির মাধ্যমে নিজের স্বজন ও দলীয় লোকদের কাছে এই জমি বরাদ্দ দেয়। ২০০৬ সালে ঢাকার শাহজাহানপুর এলাকায় জমির দাম ছিল কাঠাপতি ৩০ থেকে ৪০ লাখ টাকা। অর্থাৎ প্রতি বিঘা জমি মাত্র ৪০ লাখ টাকা দরে বিক্রি করে দেওয়া হয় মির্জা আব্বাসের নির্দেশে। বাজারদর অনুসারে এই জমির দাম তখন ৭৮ কোটি টাকা হলেও, মাত্র ৫ কোটি ২০ লাখ টাকায় তা বিক্রি করা হয়। কমপক্ষে ৭৩ কোটি টাকা কম মূল্যে এসব জমি বিক্রি করে বিপুল অঙ্কের অর্থ লুটপাট করে মির্জা আব্বাস।

এছাড়াও ১২ মার্চ, ২০০৭ সালের যুগান্তর পত্রিকার সংবাদ থেকে জানা যায়- নির্বাচনের মনোনয়ন ও দলীয় কমিটিতে পদ দেওয়ার বিনিময় নেতৃত্বক্ষেত্রের কাছ থেকে কয়েকশ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল হাওয়া ভবন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যৌথ বাহিনীর জিজ্ঞাসাবাদে তারেক এই ঘটনা স্বীকার করে। তারেক জানায়, যে ৩০ জন নেতার মাধ্যমে সারা দেশে পোস্ট-পদবি বিতরণ ও মনোনয়নেন বিষয়গুলো ঠিক করা হতো, তাদের অন্যতম হলো মির্জা আব্বাস। তাদের মাধ্যমেই এই অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল।

সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে মন্ত্রণালয়, সরকারি অফিস এবং রাজধানীজুড়ে ব্যাপক ত্রাস সৃষ্টি করে মির্জা আব্বাস। খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ হওয়ায়, অনেক বড় দুর্নীতি করলেও গণমাধ্যম পর্যন্ত কোনো সংবাদ প্রকাশের সাহস পেতো না। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর, সরকারি কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ- সবাই এসব অনিময়, দুর্নীতি এবং সন্ত্রাসের ব্যাপারে অভিযোগ করে যৌথ বাহিনীর কাছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের তদন্তে একের পর এক বেরিয়ে আসে মির্জা আব্বাসের অপকর্মের ঘটনা।

মির্জা আব্রাস: নিয়োগ বাণিজ্য এবং সরকারি প্লট বরাদে দুর্নীতি করে আয় করে শত কোটি টাকা



২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত বিএনপি-জাময়াত জোট সরকারের সময় হাওয়া-ভবন সিঙ্গিকেটের হয়ে ঢাকার সঞ্চাসীদের গড়ফাদার হয়ে উঠেছিল বিএনপি নেতা মির্জা আব্রাস। তাকে গণপৃত মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বানিয়ে নিজের স্বজনদের নামে কয়েকশ কোটি টাকার সরকারি জমি বরাদে নেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। এছাড়ও প্রভাব খাটিয়ে সরকারি জমি দখল, পানির দামে কোটি টাকার সরকারি প্লট বিক্রি এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ বাণিজ্য করে অবৈধভাবে শত কোটি টাকার মালিক হয় সে। এমনকি তার হরিলুটের নিয়োগ বাণিজ্যে বাধা দিলে, সরকারি কর্মকর্তাদের পোস্টিং করানোটা ছিল তার জন্য এক সেকেন্ডের ব্যাপার।

১৭ জুন ২০০৭ সালের সমকাল পত্রিকা থেকে জানা যায়, ২০০৬ সালের শেষের দিকে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষে ৭১ জনকে দ্রুততার সাথে চাকরি দেয় প্রতিমন্ত্রী আব্রাস। ২০ আগস্ট পত্রিকায় চাকরির বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর, শতাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে ৪ থেকে ৬ লাখ টাকা করে নেয় আব্রাস। কিন্তু এই নিয়োগে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সংস্থার চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমান। এরপর প্রতিমন্ত্রী আব্রাস তাকে সামাজিক প্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রশিক্ষণে পাঠিয়ে দেন এবং নিজের আস্তাভাজন যুগ্মসচিব বিজন কান্তি সরকারকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেয়। নিয়োগ কর্মিতির সদস্য সচিব বিদিউল আলমকে বাদ দিয়ে উপসচিব মহিউদ্দিনকে ওই পদে বসায়।

এরপর ২০০৬ সালের ৬ অক্টোবর দুই শিফটে নামমাত্র পরীক্ষা নেওয়া হয়। প্রার্থীর নাম লেখার ব্যবস্থা না রেখে শুধু সাদা পাতায় লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়। আলাদা কাগজে নাম-রোল লিখে সেটা পিন দিয়ে আটকানো হয় উত্তরপথের সাথে। যাতে পরে সেই খাতা ফেলে দিয়ে, সহজেই পছন্দের প্রার্থীদের জন্য নতুন উত্তরপত্র তৈরি করে ফাইলে ঢোকানো যায়। সকালে উপসহকারী প্রকৌশলী ও বিকালে সহকারী প্রকৌশলীদের একই প্রশ্নে পরীক্ষা নেওয়া হয়।

এ প্রসঙ্গে বিজনকান্তি বলেন, 'যে প্রশ্ন করবে, আগের রাতে তার বাসায় বিদ্যুৎ ছিল না। তাই একই প্রশ্নে দুই পদের পরীক্ষা নেওয়া হয়। আর সকালের প্রশ্নে বিকালে পরীক্ষা দিলে সেটাতে প্রশ্নফাস বলা যায় না। একজন মন্ত্রীর অধীনে অনেক প্রতিকূলতা নিয়েই কাজ করতে হয়। তবুও কোনো অনিয়ম হয়নি।'

সংস্থার কর্মকর্তারা জানান, অফিসের স্টাফদের দিয়ে দ্রুত খাতা মূল্যায়ন করানো হয়। ফলে পিওনরাও বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের খাতা মূল্যায়নের সুযোগ পেয়ে যায়। সাত হাজার প্রার্থীর মধ্য থেকে, পরেরদিনই শুধু মন্ত্রীর তালিকার ব্যক্তিদের ভাইভার জন্য ডাকা হয় এবং ২০ অক্টোবর তাদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। এর তিনদিনের মধ্যেই তারা কর্মসূলে যোগ দেয়। এমনকি তাদের পোস্টিং উপলক্ষে আরেকদফা টাকা নেওয়া হয় তাদের কাছে।

এবিষয়ে সংস্থাটির চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমান বলেন, প্রশিক্ষণ শেষ করে কর্মসূলে ফিরে দেখি যা হবার হয়ে গেছে। আমার অবর্তমানে দায়িত্বপালনকারী চেয়ারম্যান কীভাবে এতোটা অনিয়ম করতে পারলেন! এনিয়ে মন্ত্রীর সাথে আমার কতা কাটাকাটিও হয়েছে।'

আমান উল্লাহ আমান

খালেদা জিয়ার দুর্নীতিবাজ সরকার: ভূমি দস্যুতা ও চাঁদাবাজি করে শুন্য থেকে শত কোটির মালিক আমানউল্লাহ আমান



বিএনপি-জামায়াত শাসনামলের হাওয়া ভবন চক্র এবং খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমানের অন্যতম ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি আমানউল্লাহ আমান। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত খালেদা জিয়ার প্রতিমন্ত্রী থাকা অবস্থায় প্রভাব খাটিয়ে ঠিকাদারি কাজের কমিশন, চাঁদাবাজি এবং ভূমি দখল করে অবৈধভাবে শত কোটি টাকার মালিক হয় সে। ২০০৭ সালে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় নিরপেক্ষ তদন্তের পর দুর্নীতিবাজের নাম প্রকাশ করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, এরপর ২৩ বিএনপি নেতার ২২৬ কোটি অবৈধ টাকা উদ্ধার করে সরকার। এদের মধ্যে অন্যতম শীর্ষ দুর্নীতিবাজ হলো এই আমান। ২০০৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় এই খবর প্রকাশ হয়।

জানা যায়, ২০০৭ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে উঠে আসে সাবেক এই ছাত্রদল নেতার সীমাহীন দুর্নীতির চিত্র। স্থানীয়রা জানান, কেরানীগঞ্জের এক কৃষক পরিবারে জন্ম আমানের। পারিবারিক সূত্রে কোনো সম্পদ ছিল না তার। কিন্তু বিএনপির দুই মেয়াদে মন্ত্রী থাকার পর ঢাকা ও ঢাকার বাইরে কয়েক হাজার শতক জমি দখল করে সে। এসব জমি আমান ও তার স্ত্রী সাবেরা আমানের নামে দলিল করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দুর্নীতি দমন কমিশন তার ৩২টি ফ্লাটের হিসেস পায় ঢাকার অভিজাত এলাকায়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দুর্নীতি দমন কমিশন তার ৩২টি ফ্লাটের হিসেস পায় ঢাকার অভিজাত এলাকায়।

দুদক জানায়, এছাড়াও গুলশানে ৬ কাঠা জমির ওপর ৬ তরা বাসা, কেরানীগঞ্জে ৪ একর ৭৬ শতাংশ জমির ওপর বাড়ি, মানিকগঞ্জসহ মোট ৫০১ শতক জমির মালিকানা সম্পদ হিসেবে দেখিয়েছে সে। কিন্তু এর বাইরে আরও প্রায় দেড় হাজার শতক জমির তথ্যও উদ্ধার করে দুদক। কোনো আয় না থাকলেও মিরপুরে ১০ শতক জমির ওপর ৬ তলা আলিশান বাড়ি, বনানীতে ৪ কাঠা জমির ওপর ৩ তলা বাড়ি, কেরানীগঞ্জে ৫০২ শতক জমির ওপর বহুতল ভবন, এবং কেরানীগঞ্জে আরেও ৬৬০ শতক জমির পাওয়া যায় আমানের স্ত্রীর নামে।

এমনকি সাভারের জমি, ঢাকার পেট্রোল পাম্প, গার্নেন্টসসহ অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলে আমান ও তার স্ত্রী। শুধু তাই নয়, আমানের মতে তার স্ত্রীও স্বামীর প্রভাব খাটিয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করতো। ঢাকা-মাওয়া মহাসড়কের ধলেশ্বরী সেতুর টোল আদায়ের ইজারা পাইয়ে দিতে ব্যাংক চেকের মাধ্যমে ঠিকাদার খোরশেদ আলমের কাছ থেকে ৭০ লাখ টাকা আগাম নেয় সে। ২০০৭ সালের ১৯ জুন প্রথম আলো পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক খোরশেদ আলম এই তথ্য প্রকাশ করেছেন।

এভাবেই সীমান্তীন অপকর্মের মাধ্যমে দেশকে দুর্নীতিতে পাঁচ বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করে বিএনপি-জামায়াত সরকার। তাদের নিরলস লুটপাটে ভেঙে পড়ে দেশের অর্থনীতি।

পরবর্তীতে গত এক দশক ধরে- বিএনপি-জামায়াতের জুলাও-পোড়াও রাজনীতি, মানুষ হত্যা, সাম্প্রদায়িক উক্ফনি দিয়ে দাঙ্গা সৃষ্টি এবং নাশকতার মদতদাতা হিসেবে বারবার ফিরে এসেছে এই দুর্নীতিবাজ বিএনপি নেতার নাম। সাধারণ মানুষের কাছে এরা এখন ভীতিকর ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। এরা কোনো রাজনীতিবিদ নয়, রাজনীতির ছদ্মবেশে এরা জনগণের সম্পদের লুটপাটকারী, দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসের হোতা। এদের উগ্রতা থেকে মুক্তি চায় সাধারণ জনগণ।



মোসাদ্দেক আলী ফালু

হাজার কোটির মালিক, ছন্দি ও অর্থ
পাচারের অন্যতম হোতা মোসাদ্দেক
আলী ফালু



মোসাদ্দেক আলী ফালু- বাংলাদেশের এক মহা-বিতর্কিত চরিত্র। খালেদা জিয়া ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত সরকারের সময় অবৈধভাবে হাজার কোটি টাকার মালিক হয় সে। ছন্দির মাধ্যমে বিপুল অর্থ পাচার করে বিদেশের মাটিতেও গড়ে তোলে একাধিক ব্যবসা। কৌশলে ভূমি ও জলাশয় দখল, ঠিকাদারদের কাছ থেকে কাজের পারসেন্টেজ এবং সরকারি সম্পদ লুটপাট করে মিডিয়া সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল সে। খালেদা জিয়ার কারণে ফালুর নামে মুখ খোলার সাহস পেতো না কেউ। কিন্তু দৃশ্যপট বদলে যায় ২০০৭ সালে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রকাশিত হতে থাকে একের পর এক প্রতিবেদন। ফালুর সম্পদের পরিমাণ দেখে অবাক হয়ে যায় তদন্তকারীরাও।

২০০৭ সালের ১ জুন তারিখের প্রথম আলো পত্রিকার সংবাদ থেকে জানা যায়, জোট সরকারের শেষের দিকে দুর্নীতি ও লুটের টাকা পাচার এবং বিদেশে নিরাপদ বিনিয়োগের জন্য ২০০৬ সালে ১০ বার সৌদি আরব যায় সে। এছাড়াও লঙ্ঘন ও মালয়েশিয়াতে তেলের ব্যবসায় বিনিয়োগ, সৌদি আরবসহ পাঁচটি দেশে বিশেষ অ্যাকাউন্ট, এমনকি দেশের মধ্যে ফালুর ১৫টি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সন্ধান পায় আইনশংখ্যালা বাহিনী। মূলত, ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব ও এমপি থাকার সময় অবৈধভাবে অগাধ টাকা, শত শত বিঘা জমি, অজস্র বাড়ি ও ব্যবসার মালিক হয় সে।

এমনকি নামে-বেনামে ছন্দির মাধ্যমে ফালুর শত শত কোটি টাকা পাচারের বিষয়ে আলোচনা পর্যন্ত হয়েছে ব্রিটেনের পার্লামেন্টে। কারণ বাংলাদেশে খালেদা সরকারের পতন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযান শুরু হলে, ব্রিটেনের একটি মানি এক্সচেঞ্জ কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যায়। যা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয় ব্রিটিশ সমাজেও।

২০০৭ সালের ২০ জুলাই দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকা থেকে জানা যায়, ২০০৬ সালের শেষের দিকে ব্রিটেনের ফাস্ট সলিউশন মানি ট্রান্সফার লিমিটেড নামের একটি মানি এক্সচেঞ্জ কোম্পানি দেউলিয়া ঘোষণা করে নিজেকে। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিএনপি নেতা মোসাদ্দেক আলী ফালু অর্থ পাচার করতো কিনা তা পার্লামেন্টে জানতে চান ব্রিটিশ এমপিরা। এমনকি ব্রিটেন থেকে পরিচালিত ফালুর 'চ্যানেল এস' এর কার্যক্রমের বিষয়েও ক্ষেত্র প্রকাশ করেন তারা।

ব্রিটিশ এমপি জর্জ গ্যালওয়ে পার্লামেন্টে জানান, বাংলাদেশে সরকার পতনের পর দেউলিয়া ঘোষণা করা ব্রিটিশ মানি এক্সচেঞ্জ কোম্পানিটির বিরুদ্ধে আগেও অনেক অভিযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের কারণে ফাস্ট সলিউশনের অবৈধ অর্থের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়, এবং এরফলে প্রতিষ্ঠানটি দেউলিয়া হয়ে যায়- এরকম কিছু ঘটেছে কিনা তা তদন্ত করার আহ্বান জানান তিনি।

২০০৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর দৈনিক সংবাদ পত্রিকা জানায়, ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত জেট সরকার দেশজুড়ে যে হরিলুট এবং অর্থপাচায় চালিয়েছে, সেজন্যই পরপর ৫ বার দুর্নীতিতে বিশ্ব চাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তথ্যমতে- ওই পাঁচ বছরে অবৈধ সম্পদ অর্জনের তালিকায় শীর্ষে থাকা তারেক রহমান ও তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু গিয়াস উদ্দিন আল মামুনের পরপরই শীর্ষে রয়েছে ফালুর নাম।

দুর্নীতি দমন কমিশন আরও জানায়- এসবের বাইরেও ফালু ও তার পরিবাদের সদস্যদের নামে শাহজাহানপুরে একটা সাত তলা ও দুটি পাঁচ তলা বাড়ি, পুরনো ডিওএইচএসে সাড়ে আট কাঠার জমির ওপর ছয় তলা বাড়ি, গুলশানে দুটি প্লটে দেড় বিঘা জমি, তেজকুনী পাড়ায় চারটি প্লটে আড়াই বিঘা, তেজগাঁওয়ে দুটি প্লটে দশ কাঠা, মিরপুরে চার কাঠা এবং মগবাজারে তিন বিঘা জমি আছে। সাভারে আছে আরো ১০৯ বিঘা জমি। আশিয়ান সিটিতে দশ কাঠা, বসুন্ধরার দুটি প্লটে ১৫ কাঠা এবং গাজীপুরে আড়াই বিঘা জমির সন্ধান পাওয়া যায়।

এমনকি নিজের নামে বিদেশে পাঁচটি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে ফালুর। ২০০৫ সালে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার পর, ২০০৬ সালেই ১০ বার সৌদি আরব ভ্রমণে যায় সে। তার নামে ও বেনামে মোট কতো সম্পদ থাকতে পারে; তা মেলাতে হিমশিম খেতে হয়েছে গোয়েন্দাদের।

এরপরও কারসাজি করে সরকারি জমি দখল করেছে এই ধনাত্য ব্যক্তি। গণপৰ্ত মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা মূল্যের সরকারি প্লট অনিয়ম করে পানির দামে কিনে নিয়েছে সে। এমনকি সরকারি জলাশয় দখল থেকেও পিছিয়ে ছিল না ফালুর লোকজন। বিএনপি-জামায়াত সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে দেশজুড়ে নদী ও জলাশয় দখলের মহোৎসব চালায় নেতৃত্ব। ঢাকার বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদী ভরাট করে শত শত কোটি টাকার মালিক হয় বিএনপি নেতা নাসিরুদ্দীন পিন্টু, সালাউদ্দীন আহমেদ, গিয়াসউদ্দীন সেলিমরা। রাজধানীর বাইরে এই জবর-দখল অব্যাহত রাখে বিএনপি চেয়ারপারসন ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব এবং প্রতাবশালী বিএনপি নেতা মোসাদ্দেক আলী ফালু গং।

২০০৭ সালের ৩ এপ্রিল দৈনিক সমকালে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, ফেনী শহরের ঢাকা-চট্টগ্রাম ট্রাঙ্ক রোডের পশ্চিমাংশে ৫০ শতকের একটি সরকারি জলাশয় দখল করে ফালুর ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী এনামুল হক চৌধুরী সেলিম। আগে ফেনীতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত হলেও, বিএনপি-জামায়াত আমলে মোসাদ্দেক আলী ফালু সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে তার। এরপর ফালুর সহায়তায় অগ্রণী কঙ্ট্রাকশন এবং নবারূণ বিল্ডার্স নামে দুটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং কিছু মন্ত্রণালয় থেকে কোটি কোটি টাকা লোপাট করে সে।

ফালুর প্রভাবে রাতারাতি ঢাকা ও ফেনী শহরে শত কোটি টাকার মালিক বনে যাওয়া সেলিম ২০০৩ সালের ৩১ মার্চ অবৈধভাবে সরকারি জলাশয়টি নিজের নামে কিনে নেয়। ভূমি আপিল বোর্ড এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দিলেও ফালুদের নির্দেশে তা পাশ কাটিয়ে যায় তৎকালীন জেলা প্রশাসক মোস্তফা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ক্ষমতার জোরে ২০ লাখ টাকা শতকের জমি মাত্র ৬০ হাজার শতক হিসেবে কিনে নেয় সেলিম। এরপর তা ভরাট করে টিনের লম্বা ঘর তুলে দোকান এলাকা হিসেবে ভাড়া দিয়ে দেয়। প্রশাসন ও আদালত শত চেষ্টা করেও তখন সেই জমিতে ঢুকতে পারেনি।

এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে কাজ পাইয়ে দেওয়া, ব্যবসার সুযোগ করে দেওয়া এবং ঠিকাদারি কাজের কমিশন থেকেও কোটি কোটি টাকা অবৈধভাবে আয় করেছে মোসাদ্দেক আলী ফালু। তাদের দুর্নীতি, লুটপাট এবং অর্থ পাচারের কারণে ভেঙে পড়েছিল দেশের অর্থনীতি। রেমিটেন্স হয়ে পড়েছিল প্রায় শূন্য। সন্ত্রাস ও দারিদ্র্য নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল দেশের মানুষ।

মোসাদ্দেক আলী ফালু

২০০১-২০০৬ বিএনপি জামায়াত
শাসনামল: ৫ বছরে হাজার কোটির
মালিক ফালু, পাচারের টাকা বিনিয়োগ
করতে বছরে ১০ বার বিদেশ ভ্রমণ



বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব ছিল মোসাদ্দেক আলী ফালু। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে, ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত এই ৫ বছরেই হাজার কোটি টাকার মালিক হয় সে। ঢাকা-গাজীপুর-সাভারেই ১২০ বিঘা জমির দখল করে। এসব জমির বাজারমূল্য ২০০৭ সালে ছিল দেড়শ কোটি টাকা। এছাড়াও লন্ডন ও মালয়েশিয়াতে তেলের ব্যবসায় বিনিয়োগ, সৌদি আরবসহ পাঁচটি দেশে বিশেষ অ্যাকাউন্ট, দেশে ১৫টি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিক হয় ফালু। দুর্নীতি ও লুটের টাকা পাচার করে বিদেশে বিনিয়োগের জন্য ২০০৬ সালে ১০ বার সৌদি আরব যায় সে।

২০০৭ সালের ১ জুন প্রথম আলো পত্রিকার সংবাদে এসব তথ্য জানা যায়। মূলত, ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়া ক্ষমতায় থাকার সময়েও তার একান্ত সচিব ছিল ফালু। কিন্তু ওই মেয়াদে খুব বেশি সম্পদের মালিক হয়নি সে। ২০০১ সালে খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হলে তার রাজনৈতিক সচিব হিসেবে প্রভাব খাটিয়ে হাজার কোটি টাকার পাচার করে ফালু। এসব লুটপাটের টাকা দিয়ে দুটি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং একটি প্রিন্ট মিডিয়া প্রতিষ্ঠা করে গণমাধ্যম-মাফিয়া বনে যায় সে। খালেদা জিয়ার প্রভাব ও গণমাধ্যমের মালিক হওয়ায় বিএনপি-জামায়াত সরকারের আমলে কেউ টু শব্দটি পর্যন্ত করতে পারেনি ফালুর লুটপাট নিয়ে। কিন্তু ২০০৭ সালে জোট সরকারের পতন হলে মুখ খুলতে শুরু করে গণমাধ্যম।

দুর্নীতি দমন কমিশন জানায়- এসবের বাইরেও ফালুর নামে শাহজাহানপুরে একটা সাত তলা ও দুটি পাঁচ তলা বাড়ি, পুরনো ডিওএইচএসে সাড়ে আট কাঠার জমির ওপর ছয় তলা বাড়ি, গুলশানে দুটি প্লটে দেড় বিঘা জমি, তেজকুনী পাড়ায় চারটি প্লটে আড়াই বিঘা, তেজগাঁওয়ে দুটি প্লটে দশ কাঠা, মিরপুরে চার কাঠা এবং মগবাজারে তিন বিঘা জমি আছে। সাভারে আছে আরো ১০৯ বিঘা জমি। আশিয়ান সিটিতে দশ কাঠা, বসুন্ধরার দুটি প্লটে ১৫ কাঠা এবং গাজীপুরে আড়াই বিঘা জমি ও আছে তার।

তদন্তকারীরা আরও জানান, বিদেশে নিজের নামে পাঁচটি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে ফালুর। সৌদি আরবে ২০০৫ সালে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার পর, ২০০৬ সালেই ১০ বার সৌদি ভ্রমণে যায় সে। তার নামে ও বেনামে মোট কতো সম্পদ থাকতে পারে; তা মেলাতে হিমশিম খেতে হয়েছে গোয়েন্দাদের।



দলীয়করণ

২০০১ থেকে ২০০৬: যোগ্যদের বাদ
দিয়ে দলীয় বিবেচনায় ১৬০ শিক্ষক
নিয়োগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে, নেপথ্যে
হাওয়া ভবন



২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার সময় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে বিএনপি-জামায়াত জোট। একদিকে প্রগতিশীল শিক্ষকদের ওপর যেমন হামলা-নিপীড়ন চালাতে থাকে, তেমনি অন্যদিকে দলীয় বিবেচনায় শুরু করে শিক্ষক নিয়োগ। যোগ্য প্রার্থী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম, সব নিয়ম উপক্ষে করে মাত্র চার বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনপি-জামায়াতের রাজনীতির সাথে যুক্ত ১৬০ জনকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

২০০৭ সালের ৩০ মার্চ প্রথম আলো পত্রিকার প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে আসে। জানা যায়, ২০০২ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত ১৮৮ জন শিক্ষক নিয়োগ পায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। এরমধ্যে ১৬০ জনই জামায়াতের সমর্থক হিসেবে পরিচিত। সিনিয়র শিক্ষকরা তাই রসিকতা করে বলতেন, শিক্ষক নিয়োগ নয় উপাচার্য ভোটার নিবন্ধনের কাজ করেছেন। মেধাবীদের বাধিত করে দলীয় বিবেচনায় শিক্ষক নিয়োগের প্রতিবাদে ২০০৮ সালের ১২ আগস্ট আচার্য ও রাষ্ট্রপতিকে চিঠি পাঠায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি। পর্যাপ্ত ভাগ না পাওয়ায় ছাত্রদল নেতাকর্মীরাও জামায়াতপন্থী উপাচার্যের পদত্যাগের দাবি তুলেছিল সেসময়।

জানা যায়- কলা অনুষদে ৩৮, সমাজবিজ্ঞান অনুষদে ২০; আইন বিভাগে ৩, বাণিজ্য অনুষদে ১৫, বিজ্ঞান অনুষদে ৩৯, জীববিজ্ঞান অনুষদে ৩২, সমুদ্রবিজ্ঞান ইঙ্গিটিউটে ৭, এনভারনমেন্টাল সায়েন্সে ৬ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এদের সবাই জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

প্লানিং কমিশনের সুপারিশ উপক্ষে করে কোনো প্রথম শ্রেণি না থাকলেও এস এম রিজাউল ইসলামকে বাংলা বিভাগে নিয়োগ দেওয়া হয়। তার প্রতিদ্বন্দ্বিদের কারো পিএইচডি আবার কারো তিনটি প্রথমশ্রেণি থাকলেও তাদের নেওয়া হয়নি। রিজাউলের একমাত্র যোগ্য, সে ছাত্র শিক্ষিরের কর্মী। অথচ পরীক্ষায় নকলের জন্য এক বছর বহিক্ষারও ছিল সে ছাত্রজীবনে। এমনকি প্রভাষক হিসেবে নিয়োগের ২৩ দিন পরেই তাকে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি দেন উপাচার্য নুরুল্লাহ। প্রথম আলোর কাছে এই অনিময়ের কথা স্মীকার করেছে স্বয়ং রিজাউল।

নিয়োগের শর্ত ভেঙে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে দুজনকে (আল মারজান ও আবু আহমেদ) প্রভাষক পদে নিয়োগ দেওয়া হয় শিবির পরিচয়ের কারণে। অন্যদিকে সব শর্ত পূরণ করেও সংখ্যা লঘু হওয়ার কারণে বাদ পড়ে যান যোগ্য প্রার্থী। ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগে অ্যাডহক ভিত্তিতে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ পান তৈয়াব চৌধুরী, অথচ এর আগে শিক্ষকতার কোনো অভিজ্ঞতাই নাই তার। শুধু জামায়াতের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হওয়ার কারণেই মাত্র ১১ মাসের মধ্যে তাকে অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হয়।

কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পায় সানাউল্লাহ, তার একমাত্র পরিচয় হলো তিনি গোহাঙড়া জামায়াতের আমীরের ভাতিজা। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচজন প্রার্থীকে বাদ দিয়ে চট্টগ্রাম ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা এই প্রার্থীকে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ দিয়ে নিয়োগের শর্ত ভঙ্গ করা হয়।

এছাড়াও অর্থনৈতি বিভাগের একটি পদের বাইরে চারজনকে নিয়োগ দেওয়া হয় ২০০৮ সালে। তাদের মধ্য মোরশেদুল হক ও সেলিম উদ্দিন শিবিরের রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। যাদের বাদ দেওয়া হয়েচে তাদের চারটিতেই প্রথম শ্রেণি, আবার বোর্ডের মেধা তালিকাতেও ছিলেন দুজন। তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান নোট অব ডিসেন্ট দিয়েও এই নিয়োগ ঠেকাতে পারেননি। ভূগোল বিভাগে একটি অধ্যাপক পদের বিপরীতে দুটি প্রভাষক পদের নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়, যা প্লানিং কমিশনের নিয়মবিহীন।

জানা যায়, জামায়াতের শিক্ষকদের দিয়ে ছায়া সিভিকেট গঠন করা হয়েছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারাই নিয়ন্ত্রণ করতো নিয়োগের বিষয়াবলী। আর এই সিভিকেট নিয়ন্ত্রণ করতেন ড. মাহবুব উল্লাহ। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় তিনি নিয়মিত হাওয়া ভবনে যেতেন এবং বৈঠক করতেন। প্রথম আলোর কাছে এটি স্বীকার করেছেন তিনি।



২০০১-এ খালেদার আমল: বিএনপি'র রাজনীতি না করার দরুণ অকারণে চাকরি হারাতেন পেশাজীবীরা



২০০১ সালের ১ অক্টোবর অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয় লাভের পরপরই দেশজুড়ে তাণ্ডব শুরু করে বিএনপি-জামায়াত জোট। শিবির, ছাত্রদল, যুবদলের সন্ত্রাসীদের হত্যা, লুটপাট, ধর্ষণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে দেশের মানুষ। এমনকি খড়গ নেমে আসে সাধারণ সরকারি চাকরিজীবীদের ওপরও। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া যেসব কর্মকর্তা প্রশাসন ও পুলিশের বিভিন্ন পদে ছিলেন, গণহারে চাকরিচ্যুত করা হয় তাদের। এর আগে, ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত অবৈধভাবে দেশের ক্ষমতা দখলকারী বৈস্রাচার জিয়াউর রহমানের সময়েও একই কাজ করেছেন তিনি। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের অঙ্গুহাতে প্রহসনের বিচারে রাতারাতি সেনা-নৌ ও বিমান বাহিনীতে কর্মরত মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর গণহত্যা চালান খালেদা জিয়ার স্বামী জিয়াউর রহমান।

জিয়াউর রহমানের দেখানো পথেই হেঁটেছেন খালেদা জিয়া। ১৯৯১ সালে প্রথমবার সরকার গঠনের পর রাজাকার, মৌলবাদ ও উগ্রবাদীদের পুনর্বাসন করেন তিনি। পরের বার ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসার পর প্রশাসনকে রাজনীতিকরণের উদ্দেশ্যে চাকরিজীবীদের ওপর খড়গ চালান তিনি।

২০০১ সালের ৬ ডিসেম্বরের প্রথম আলো পত্রিকার প্রধান হেডলাইন হয় খালেদা জিয়ার সরকার গঠনের পরেই গণহারে মুক্তিযোদ্ধা ও সরকারি কর্মজীবীদের চাকরিচ্যুতির বিষয়টি। প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ১০ অক্টোবর খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার গঠনের পর ১৫ জন সচিবের রদবদলের মাধ্যমে প্রশাসনে অস্থিরতা শুরু করে। এরপর সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও নারী কর্মকর্তাসহ ৫০ জনের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল এবং বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়। ৩৬ জন পুলিশ কর্মকর্তাসহ প্রশাসন ক্যাডরের শতাধিক কর্মকর্তাকে এসডি করা হয়। অতিরিক্ত আইজিসহ পুলিশের ৯ জন কর্মকর্তাকে পাঠানো হয় বাধ্যতামূলক অবসরে।

এমনকি বিএনপি-জামায়াত নেতাদের রাজনৈতিক সুপারিশ অনুসারে সচিব, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা প্রশাসক, পুলিশের এসপি-ওসি প্রত্বন্তি তিনি শতাধিক পদে ব্যাপক রদবদল করা হয়। যাদের চাকরিচ্যুত, বাধ্যতামূলক অবসর, ওএসডি বা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে; তাদের কারো বিরুদ্ধেই অদক্ষতা বা অযোগ্যতা বা দুর্ব্লিতির কোনো অভিযোগ নেই। সরকারের পক্ষ থেকেও তেমন কোনো অভিযোগ উত্থাপন করা হয়নি। এমনকি তত্ত্বাধায়ক সরকারের সময় মাত্র কয়েকমাস আগে 'নিরপেক্ষ' মনে করে নিয়োগ দেওয়া শতাধিক সরকারি কর্মকর্তাকেও বিএনপি-জামায়াত সরকারের রোষানলে পড়তে হয়েছে। এর মূল কারণ, দক্ষ কর্মকর্তাদের সরিয়ে দিয়ে রাজনৈতিকভাবে পক্ষপাতদুষ্ট লোকদের নিয়োগের পথ সৃষ্টি করা।

প্রশাসনের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা জানান, যাদের অন্যায্যভাবে পদচুয়ে বা কমইন করা হয়েছে তাদের সিনিয়রদের সবাই ১৯৭৩-সালের ব্যাচের কর্মকর্তা। তাদের অধিকাংশই ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। গণহারে সর্বস্তরের সরকারি পেশাজীবীদের চাকরিচ্যুত, ওএসডি এবং রদবদলের ফলে কর্মকর্তাদের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেয়। এমনকি হয়রানি থেকে বাঁচার জন্য রাজনৈতিক আনুকূল্য পাওয়ার আশায় ছোটাছুটি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন পেশাজীবীরা। ফলে ভেঙে পড়ে চাকরিবিধি ও চাকরির কাঠামো। বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে প্রশাসন।

খালেদা জিয়ার দুঃশাসন: অবৈধভাবে শত শত জামায়াত নিয়োগ এবং বিকৃত ইতিহাসের চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়



উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে মুক্তি সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ইতিহাস বিকৃত করে খালেদা জিয়ার সরকারকে খুশি করেছিল উপাচার্য এরশাদুল বারী। এরপর বিএনপি-জামায়াত সরকারের পুরো শাসনামলজুড়ে নিয়োগবাণিজ্য করে অবৈধভাবে কোটি কোটি টাকা আয় করেন। এমনকি দক্ষ শিক্ষক-প্রশাসক এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের কারণে-অকারণে বরখাস্ত করে দমিয়ে রাখতেন তিনি। নিয়মবহির্ভূতভাবে জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীদের মধ্য থেকে পাঁচ শতাধিক নিয়োগ দিয়ে জামায়াত নেতাদেরও খুশি করে দেন তিনি। সেই সুবাদে নিজের স্বজনদেরও ঢালাওভাবে নিয়োগ দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে পঙ্গু করে দেন এই ভিসি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ২০০৭ সালের ১৯ জানুয়ারি দৈনিক সমকাল পত্রিকার সংবাদ থেকে জানা যায়, ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় যাওয়ার পর ভিসি হওয়ার পর থেকে ৭ শতাধিক শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ৫০ হাজারের বেশি টিউটর নিয়োগ দেন তিনি। তার নিয়োগের অধিকাংশই জামায়াত নেতাদের আত্মীয়-স্বজন এবং শিবিরের নেতাকর্মী। তাদের আগে অ্যাডহকে নিয়োগ দেওয়া হতো, এরপর পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে শথ শত প্রার্থীর ভাইভা নিলেও নিয়োগ পেতো তালিকাভুক্ত দলীয় ব্যক্তিরাই।

সেই সুযোগে নিজের স্বজনদেরও চাকরিতে চুকিয়ে দিতেন এই ভিসি। এসব নিয়োগ দুর্নীতির এক পর্যায়ে বাউবির শিক্ষকরা ভিসির ২৩ স্বজনের নাম-পরিচয় এবং ভিসির সাথে সম্পর্ক কৰ্ত্তা, সেটার বিস্তারিত তথ্যসহ রাষ্ট্রপতি বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছিল। তবে কোনো লাভ হয়নি।

এদিকে ভিসির অন্যায় আবদার না রাখার কারণে শতাধিক শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীকে হয়রানিমূলকভাবে বরখাস্ত ও বদলি করা হতো। এমনকি এরশাদুল বারীর অত্যাচারে চাকরি পর্যন্ত ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন অনেকে।

এদিকে এতো কিছু করলেও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্তা না নেওয়ার অন্য আরো একটি কারণ হলো খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমানের সঙ্গে একটি লিয়াজো রাখা। খুবই ঘৃণ্য এক কাজের মাধ্যমে সরকারের এতা পছন্দের ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন তিনি। সেই কাজটি হলো- পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতি। মূলত পাঠ্যপুস্তকে প্রকাশিত স্বনামধন্য লেখকদের লেখা বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করেছিলেন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এরশাদুল বারী। ভিসি হয়েই ২০০২ সালে পাঠ্যপুস্তকের তথ্য বিকৃতি করেন তিনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় গণমাধ্যমে তথ্য প্রকাশের পর সেই সংস্করণের বই বাতিল করা হয় এবং পরবর্তীতে ইতিহাস বিকৃতির দায়ে আদালতে তলব করা হয় এরশাদুল বারীকে।

এই দুর্নীতিবাজ এবং জামায়াতপন্থী শিক্ষক দেশের নতুন প্রজন্মকে ভুল ইতিহাস শেখানোর মাধ্যমে ৩০ লাখ শহীদের আত্মাদান এবং দুই লাখ নারীর ত্যাগের ইতিহাসকে হেয়প্রতিপন্থ করেছেন। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পৌরনীতি বইয়ের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অধ্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামের আগ থেকে ‘জাতির জনক’ শব্দটি উঠিয়ে দেন তিনি। এরপর স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে বঙ্গবন্ধু নাম বদলে দিয়ে জিয়াউর রহমানের নাম সংযুক্ত করেন। এছাড়া অসহযোগ আন্দোলন, মুজিব নগর সরকার এবং ৭ মার্চের ভাষণকেও বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছিলেন। বিনিময়ে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের কাছ থেকে লাগামহীন দুর্নীতি করার লাইসেন্স পান তিনি।

২০০১ থেকে ২০০৬: স্পিকারের চেয়ারে বসে পাঁচ শতাধিক নিয়োগ বাণিজ্য করেন জমিরউদ্দিন সরকার



২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত সরকারের আমলে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া প্রত্যক্ষভাবে তার দুই ছেলে তারেক ও কোকোকে হাজার হাজার কোটি টাকা দুর্নীতিতে সহায়তা করেন। এমনকি তার ভান্নেরাও সরকারের কোটি কোটি টাকা লুটপাট করে। একই সঙ্গে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে থাকা বিএনপির নেতা, মন্ত্রী-এমপিরাও হরিলুট শুরু করে। এমনকি জাতীয় সংসদ সচিবালয়েই পাঁচ শতাধিক নিয়োগ বাণিজ্য করেন খালেদা জিয়ার স্পিকার জমিরউদ্দিন সরকার। জমিরউদ্দিনের এসব দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে তারেক রহমান সংসদ সচিবালয় থেকে গাড়ির তেল পর্যন্ত কিনে নিতেন অবৈধভাবে।

২০০৭ সালের ২৭ জানুয়ারি দৈনিক সমকালের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, কোনো নিয়মের তোয়াক্তা না করে জাতীয় সংসদে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগে রেকর্ড করেছেন স্পিকার জমিরউদ্দিন সরকার। এই নিয়োগের সংখ্যা পাঁচশ ছাড়িয়ে গেছে। এমনকি সরকারের শেষের দিকে (২০০৬ সাল) সংসদ কার্যকর না থাকলেও দেড়শ কর্মচারী নিয়োগ দেন তিনি। প্রতি নিয়োগে পাঁচ লাখ টাকা করে লেনদেন হয় তার অফিসের সহকারী ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তার মাধ্যমে।

এমনকি মাস্টাররোল থেকে চাকরি স্থায়ীকরণের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের নির্দেশনায় বলা ছিল, ১৯৯৪ সালের আগে থেকে যারা চাকরি করছে তাদের স্থায়ী করতে হবে। তবে আদালতের সেই আদেশকে অমান্য করে ১০১ জনকে স্থায়ীভাবে চাকরিতে নিয়োগ দেন জমিরউদ্দিন। এমনকি সরকারের মেয়াদ শেষেও ১৯৪ জনকে তৃতীয়, চতুর্থ, ড্রাইভার, মালি, ব্যক্তিগত সহকারী প্রত্বতি পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। এমনকি নিজ দলীয় ডেপুটি স্পিকারকে পাশ কাটিয়েই এসব নিয়োগ দেওয়ায় দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। পরে খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা রাজাকার সালাউদ্দিন চৌধুরী বিষয়টি মীমাংসা করে দেয়।

এসব নিয়োগে খোদ স্পিকারের বিরুদ্ধে মোট দশ কোটি টাকার ওপরে নিয়োগ বাণিজ্য, দলীয়করণ এবং স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ওঠে। এব্যাপারে ডেপুটি স্পিকার আখতার হামিদ সিদ্দীকি বলেন, এসব নিয়োগে তিনি জড়িত নন। কীভাবে এতো নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, তা ও তিনি জানেন না। এমনকি এসব নিয়োগ নিয়ে তৎকালীন রাজনৈতিক দলগুলো সংসদে আলোচনা করতে চাইলেও, স্পিকারের তাদের সেই সুযোগ দেননি বলেও অভিযোগ করেন বিরোধী দলীয় নেতারা।

সাবেক স্পিকাররা এ বিষয়ে বলেন, জমিরউদ্দিন সরকার স্পিকারের পদকে কলঙ্কিত করেছেন। দলীয় বিবেচনায় এবং নিয়োগ বাণিজ্যের জন্য প্রতিবছর ধাপে ধাপে তিনি পাঁচ শতাধিক নিয়োগ সম্পন্ন করেন। সংসদের জন্য এটি একটি ন্যাকারজনক ঘটনা।



খালেদা জিয়ার দুঃশাসন: পিএসসির বোডে সব বিএনপি-জামায়াতের লোক, মোটা অর্থের বিনিময়ে বিসিএসে নিয়োগ!



খালেদা জিয়ার
দুঃশাসন
পিএসসির বার্ডে
সব বিএনপি
জামায়াতের লোক,
মোটা অর্থের
বিনিময়ে বিসিএসে
নিয়োগ!

২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত সরকার গঠনের পরপরই সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে দলীয়করণ শুরু করে। এমনকি পিএসসি-এর মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকেও দুর্নীতির আঁখড়া পরিণত করে তারা। নগদ টাকার বিনিময়ে বিসিএস-এর প্রশংস্ফাঁস ও পরীক্ষার খাতা জালিয়াতির মাধ্যমে নিয়োগ বাণিজ্য এবং দলীয় কর্মীদের অসৎ উপায়ে চাকরিতে নিয়োগ দিতে শুরু করে। ফলে মেধাবী শিক্ষার্থীরা বাস্তিত হয় ন্যায় চাকরি থেকে। ২৪-তম বিসিএসের প্রশংসন ফাসের ঘটনায় দেশজুড়ে সমালোচনার বাড় ওঠে। সীমাহীন দুর্নীতির কারণে ২৭-তম বিসিএস পরীক্ষার ভাইভার রেজিস্ট্রেশন বাতিল ঘোষণা করতে বাধ্য হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

২০০৭ সালের ২৭ জানুয়ারি সমকালের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে নথিপত্রসহ এসব দুর্নীতির চিত্র উঠে আসে। জানা যায়, পিএসসির চেয়ারম্যানসহ ১০ সদস্যকে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ দেয় খালেদা জিয়ার সরকার। এরপর তাদের মাধ্যমে নিয়োগবাণিজ্য এবং দলীয়করণ শুরু করে তারেক রহমানের হাওয়া ভবন চক্র। ২৫তম বিসিএস-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত পিএসসির সদস্য অধ্যাপক মাহফুজুর রহমানের আপন ভাই প্রশাসন ক্যাডারের মামুনুর রশিদ চাকরিপ্রার্থীদের সাথে পিএসসি সদস্যদের 'কট্টাট্যান' হিসেবে কাজ করতো। মামুন নিজে জোট সরকারের প্রতিমন্ত্রী লুৎফর রহমান খান আজাদের এপিএস হিসেবে পাট ও বন্ধু মন্ত্রণালয় এবং এনজিও বুরোতে কাজ করেছে। তার মাধ্যমেই বিএনপির হাই কমান্ড বিসিএসে পুলিশ ও প্রশাসনে নিজেদের লোক নিয়োগ করতো।

টাকার হিসাব বন্টনের জন্য তাই মামুন একটি ডায়রি ব্যবহার করতেন। কোন প্রার্থীর কাছ থেকে কতো নিতেন এবং পিএসসির কোন সদস্যকে কতো দিতেন, কোন প্রার্থীর জন্য কোন নেতার সুপারিশ, সেটার সব তথ্য লেখা থাকতো সেখানে। তার বড় ভাই 'পিএসসি সদস্য অধ্যাপক মাহফুজুর রহমান সাংবিধানিক এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকা অবস্থাতেই নীলফামারীর একটি আসনে বিএনপির হয়ে গণসংঘোগ করতেন এবং নবম জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিতে চেয়েছিলেন। পিএসসি চেয়ারম্যান জেডএন তাহমিদা বেগম ও প্রভাবশালী সদস্য মাহফুজ পর্দার অন্তরালে থেকে কাজ করতেন। সামনে থাকতো মামুন।

সমকালের অনুসন্ধানে মামুনুর রশিদের সেই ডায়রি পাওয়া যায়। সেখানে প্রার্থীদের নাম, মোবাইল নম্বর, ক্যাডারের নাম, পাশে টাকার হিসাব লেখা। সেই তালিকা ধরে ফোন দেওয়ার পর প্রার্থীর পরিবার জানায়- তারা চাকরি পেয়েছেন এবং ট্রেনিংয়ে আছেন। তবে একজন চাকরি পাননি এমন তথ্যও জানা যা। তবে তাকে ২৭ তম বিসিএসে সেই ক্ষতি পুরিয়ে দেওয়া হয়। এসব তথ্যপ্রমাণসহ পিএসসি চেয়ারম্যান জেডএন তাহমিদা বেগমের সাথে কথা বলতে চাইলে তিনি ফোনে কথা বলতে অস্বীকার করেন। প্রসঙ্গত, এই পিএসসির চেয়ারম্যানের সাথে যোগসাজশ করে বিএনপিপন্থী চিকিৎসকদের সংগঠন ড্যাঃ-এর মহাসচিব ডাঃ জাহিদ অবৈধভাবে কয়েকশ চিকিৎসকের নিয়োগ ও পদায়ন করেছিল, যা নিয়ে বাংলাদেশের চিকিৎসাজনে সমালোচনার বাড় উঠেছিল সেসময়। কিন্তু এরা হাওয়া ভবনের ঘনিষ্ঠ লোক হওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি এদের বিরুদ্ধে।

এদিকে মুক্তিযোদ্ধার সত্তান পরিচয় শোনার পর ভাইভা বোর্ড থেকে প্রার্থীকে বের করে দিতেন আরেক পিএসসি সদস্য সাবেক যুগ্ম সচিব মোজাম্মেল হক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চারটি প্রথম শ্রেণি পাওয়া ইয়াসমিন সুলতানাকে ২৭তম বিসিএসের ভাইভা বোর্ড থেকে বের করে দেন তিনি। ইয়াসমিন জানান, তার বাবা মুক্তিযোদ্ধা এই কথা শোনার পরেই তাকে বের করে দেওয়া হয়। এবিষয়ে জানতে চাইলে অভিযুক্ত মোজাম্মেল হক বলেন, 'আমি যোগ্যতায় বিশ্বাসী। তবে পিএসসিতে চরম দুর্নীতিবাজ একটি চক্র রয়েছে। ওদের বিরুদ্ধে লেখেন না কেন?' সেই দুর্নীতিবাজদের নাম জানতে চাইলে তিনি আরো বলেন, 'তারা অনেক প্রতাবশালী। নাম বললে আমাকে গুলি করে মেরে ফেলবে তারা।'

২৭ তম বিসিএস বোর্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত আরেক সদস্য আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী ব্যাপক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তিনি পিএসসির একজন সহকারী পরিচালক ও নিজের পিও এর মাধ্যমে লেনদেন করতেন বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপকভাবে তথ্য ছাড়িয়ে পড়ে। তার রেফারেন্স দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এক প্রার্থী আগে থেকেই এএসপি হবে বলে এলাকায় বলে বেড়াতো, এবং সে হয়েছে। জনশ্রুতি আছে ২১ লাখ টাকা লেনদেন হয়েছে এই নিয়োগে।

২৫ ও ২৭ তম বিসিএস পরীক্ষার মাঝখানে ২৬তম বিসিএস ছিল শুধু শিক্ষা ক্যাডার। সেটির অধিকাংশ নিয়োগে গড়ে পাঁচ লাখ টাকা করে লেনদেন এবং বিএনপি-জামায়াত দলীয় ব্যক্তিদের স্বজনদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় মার্কশিট বদল করে নাস্বার বাড়িয়ে দেওয়া এবং ভাইভায় বেশি নাস্বার দেওয়ার মাধ্যমে এই দুর্নীতি করা হতো। এছাড়া তারেক রহমানের তালিকা ধরে শুধু বগুড়া ও আজিজুল হক কলেজ ছাত্রদল নেতাকর্মীদের মধ্য থেকে ২৫ জনের অধিক ব্যক্তিতে পুলিশ ক্যাডারে নিয়োগ দেওয়ার মতো জঘন্য ও নিন্দনীয় ঘটনাও ঘটিয়েছে বিএনপি-জামায়াত আমলের পাবলিক সার্ভিস কর্মশণ (পিএসসি)। দেশে এরকম ন্যাকারজনক ঘটনা এর আগে বা পরে আর কখনোই ঘটেনি।

এমনকি পিএসসির মাধ্যমে রাতারাতি ৩০০ ছাত্রদল নেতাকে উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিয়ে ভোট জালিয়াতি করার নীল নকশাও করেছিল খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান। তবে পরবর্তীকারে তত্ত্ববধায়ক সরকোর ক্ষমতায় আসার পর তাদের এই অপপ্রয়াস নষ্ট হয়। এছাড়াও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনার দাবির মুখে বিএনপি-জামায়াতের তৈরি করা ভোটার তালিকা যাচাই করে ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার শনাক্ত করে নির্দলীয় তত্ত্ববধায়ক সরকার।



আগুন সন্ত্রাস

বিএনপি-জামায়াতের নাশকতা:
যোগাযোগ, বাণিজ্য ও শিক্ষা
পরিবেশ ভেঙে পড়ে; ৬ মাসে ক্ষতি
৫০ হাজার কোটি টাকা

বিএনপি-জামায়াতের নাশকতা
যোগাযোগ, বাণিজ্য ও শিক্ষা পরিবেশ ভেঙে পড়ে!
৬ মাসে ক্ষতি ৫০ হাজার কোটি টাকা!

সহিংসভাবে ক্ষতি সৃষ্টি হাজারে হোটে টাকা

বিএনপি-জামায়াতের নাশকতার কারণে ২০১৩ সালের জুলাই থেকে ২০১৪ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত রাষ্ট্রের ক্ষতি হয়েছে কমপক্ষে ৪৯ হাজার কোটি টাকা। মাত্র ছয় মাসের মধ্যে অবরোধ, হরতাল, সরকারি সম্পদ ধ্বংস, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অকার্যকর করা এবং নাশকতায় শতাধিক মানুষ হত্যা ও সহস্রাধিক ব্যক্তিকে পঙ্গু করার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবিকা এবং দেশের অর্থনৈতিক ধ্বংস করে দেয় বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীরা। স্কুল কলেজে বোমা মেরে, কয়েকশ স্কুল পুড়িয়ে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের হত্যা করে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে এই দুর্ব্বলতা। উপরে ফেলে রেললাইন, কেটে দেয় মহাসড়ক, তাদের আগুনে পুড়ে যায় কয়েক হাজার বাস-ট্রাক এবং রেলের বগি ও রেলওয়ে স্টেশন।

২০১৪ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে আসে। বেসরকারি সংস্থা সিপিডির অর্থনৈতিক পর্যালোচনায় বলা হয়, রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে সৃষ্টি পরিস্থিতির জন্য ছয় মাসে ৪৯ হাজার ১৮ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে দেশে। শুধু রেল ও সড়ক যোগাযোগ খাতেই ক্ষতি হয়েছে ১৬ হাজার কোটি টাকা। কৃষি ও কৃষিজাত শিল্পে ১৫ হাজার ৮২৯ কোটি টাকা, রফতানিমুখী বস্তু শিল্পে ১৩ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা এবং পর্যটন খাতে ২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার লোকসান হয়।

দেশের অর্থনৈতিক বিদ্রো মনে করেন, বিএনপি-জামায়াতের এই নৃশংস নাশকতার কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে কৃষি, কৃষিজাত খাত ও পরিবহন খাতের ক্ষুদ্র উৎপাদকেরা, যার সঙ্গে দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী যুক্ত। এরপরেই আছে রফতানিমুখী শিল্প, যার সঙ্গে অন্তত এক কোটি মানুষের জীবিকার সম্পর্ক। ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে যায়।

নাশকতার কারণে পরিবারের উপর্যুক্ত ব্যক্তিকে হারিয়ে পথে বসে পড়ে স্বল্প আয়ের মানুষরা। ভবিষ্যতের স্বল্প নিয়ে যে মেধাবী শিক্ষার্থী বেংগে উঠছিল, তার অকার মৃত্যু এবং পঙ্গুত্বের কারণে স্বল্প লুট হয়ে যায় অনেক নিম্নমাধ্যবিক্রি পরিবারের। খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের সুরাসারি নির্দেশে রাজনীতির নামে এভাবেই দেশকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীরা।



পেট্রোল বোমা মেরে একদিনে ১২
জনকে পুড়িয়ে হত্যা, যানবাহনকে
কফিনে পরিণত করে
বিএনপি-জামায়াতের নেতারা



**পেট্রোল বোমা মেরে
একদিনে ১২ জনকে পুড়িয়ে হত্যা! যানবাহনকে
কফিনে পরিণত করে বিএনপি-জামায়াত!**

২০১৪ ও ২০১৫ সালে দুই দফায় দেশজুড়ে পেট্রোল বোমা ও অগ্নিসন্ত্রাসের মাধ্যমে শত শত সাধারণ মানুষকে হত্যা করে বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীরা। খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের সরাসরি নিদেশে এই নারী-শিশু ও কর্মজীবী অসহায় মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে তারা। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, অসহায় শ্রমজীবী ও চাকরিজীবী মানুষকে নির্মমভাবে খুন করে একেকটি পরিবারকে পথে বসায় বিএনপি-জামায়াতের রাজনীতিবিদ নামক দুর্ভূতরা।

২০১৫ সালের ৪ জানুয়ারি প্রথম আলোর প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, কুমিল্লায় রাত সাড়ে তিনটার দিকে যাত্রীবাহী বাসে পেট্রোল বোমা ছুড়ে সাতজনকে হত্যা করা হয়েছে। কক্সবাজার থেকে ঢাকাগামী ওই বাসটি চৌদ্দগ্রামে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অতিক্র করার সময় এই নশংস হামলা চালায় বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাসীরা। সাথে সাথে দাউ দাউ করে জুলে ওঠে বাস। অনেকেই ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন বাসের ভেতর। ফলে বাবা-মেয়ে, মা-ছেলেসহ ৭ জন পুড়ে মারা যায়। দন্ত হয় ১৯ জন।

হ্রন্তীয়রা জানান, চৌদ্দগ্রামে জামায়াত-শিবিরের আধিপত্য প্রবল। রাত তিনটার দিকে পার্শ্ববর্তী একটি সড়কে একটি লোকাল বাসে আগুন দেয় দুর্ভূতরা। পুলিশ সেখানে গেলে পরে হাইওয়েতে এই নাশকতা ঘটায় তারা।

এছাড়াও একই দিন বরিশালে ট্রাকে পেট্রোল বোমা হামলায় ২ জন, লক্ষ্মীপুরে পিকআপ ভ্যানে হামলায় ১ জন এবং যশোরে ২ জনের মৃত্যু হয়। এছাড়াও হামলায় ময়মনসিংহ ফায়ারসার্ভিস কার্যালয়ের ভেতরে একটি গাড়ি, কিশোরগঞ্জে কাভার্ড ভ্যান, গাজীপুর-গাইবান্ধা-ঢাকা-ভৈরব-বাগেরহাটে বাস ও পণ্যবাহী ট্রাকে আগুন দেয় বিএনপি-জামায়াত। তাদের অতক্ত পেট্রোল বোমায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় পাবনা-বগুড়া-নারায়ণগঞ্জসহ বেশ কিছু স্থানের মানুষের ব্যবসা ও দোকানপাট। আগুনে দন্ত হয় প্রায় অর্ধশত ড্রাইভার-হেলপার, রিকশাচালক ও ফুটপাতের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী।



বিএনপি-জামায়াতের জ্বালাও-পোড়াও: প্রতিদিন রাত্রের ক্ষতি আড়াই হাজার কোটি টাকা, ক্ষতিগ্রস্ত হয় রেমিটেন্স



২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত কয়েক ধাপে দেশজুড়ে জ্বালাও-পোড়াও, চলন্ত যানবাহনে পেট্রোল বোমা হামলা, সড়কে ককটেল ও হাতবোমা বিক্ষেপণ ঘটিয়ে সাধারণ মানমের জীবন দুর্বিষ্ণব করে তোলে বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীরা। যানবাহন চালক, দিনমজুর, কর্মজীবী মানুষ, শিক্ষার্থী, নারী-শিশুসহ সহস্রাধিক মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে তারা। পুড়িয়ে দেয় কয়েক হাজার বাস-ট্রাক। ফলে স্থবির হয়ে পড়ে দেশের শিক্ষাঙ্গণ, কৃষিক্ষেত্র, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা। আমদানি-রফতানি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রা অজনের ওপর প্রভাব হয়।

২০১৫ সালের ২৩ জানুয়ারি প্রথম আলো পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, হরতাল-অবরোধের নামে বিএনপি-জামায়াতের অন্তিসন্তানের কারণে গড়ে প্রতিদিন ২ হাজার ২৭৮ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে রাত্রে। এমনকি এই ক্ষতির পরিমাণ পরবর্তীতে বেড়ে গড়ে প্রতিনিদি আড়াই হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়।

নাশকতার প্রথম ১৬ দিনে ক্ষতির পরিমাণ ৩৬ হাজার ৪৪৫ কোটি ৭৬ লাখ টাকা, যা বছরের দেশজ উৎপাদনের প্রায় ৩ শতাংশ।

সন্ত্রাসের কারণে অভ্যন্তরীণ হিসেবেও প্রতিদিন গড়ে কৃষিখাতে ২৮৮ কোটি, পোল্ট্ৰি শিল্পে ১৮ কোটি ২৮ লাখ, হিমায়িত খাদ্যে ৮ কোটি পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ৩০০ কোটি, পর্যটন শিল্পে ২০০ কোটি, আবাসন খাতে ২৫০ কোটি, শার্পিং কমপ্লেক্সসহ দোকানপাট খাতে ১৫০ কোটি, প্লাস্টিক পণ্য খাতে ১৭ কোটি ৮৫ লাখ এবং বীমা খাতে ১৫ কোটি টাকা করে ক্ষতি হয়েছে।

অবরোধের কারণে চট্টগ্রাম বন্দরে ২৬ হাজার কনটেইনার আটকা পড়ে। ফলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কাঁচামাল সরবরাহ ব্যাহত হয়। বিভিন্ন স্থলবন্দর থেকে ব্যবসায়ীরা পণ্য খালাস করতে না পারায় প্রতিদিন তাদের অন্তত ১০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়। একদিনের অবেরাধের কারণে ৬৯৫ কোটি টাকার পোশাক রফতানি বাধাগ্রস্ত হয়। প্রাত্যহিক ক্ষতির পরিমাণ ১৪৭ কোটি ৫০ লাখ টাকা। শিল্প কারখানাগুলোতেও সক্ষমতার চেয়ে ২৫ শতাংশ কম উৎপাদন হয়। ফলে প্রতিদিন উৎপাদন কম হয়েছে প্রায় ২১৯ কোটি টাকার।

জ্বালাও-পোড়াও পরিস্থিতির কারণে ক্রিনিভর গ্রামীণ অর্থনীতি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষেত্রের শাক-সবজি তোলার পরেও তা ন্যায্য দামে বিক্রি করতে পারেনি কৃষকরা। আবার পচনশীল দ্রব্য হওয়ায় সেগুলো সংরক্ষণ করাও সম্ভব হয়নি। ফলে যেসব স্থানে কৃষিজ পণ্য উৎপাদন হয়, সেখানে পানির দামে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন কৃষকরা। আবার যানবাহনে পরিবহন করা বাঁকিপূর্ণ হওয়ায়, যেসব স্থানে ফসল ও সবজি কম উৎপাদন হয়, সেসমসব স্থানেও কৃষকরা তাদের পণ্য পৌছে দিতে পারেননি। ফলে বাজার ব্যবস্থার ওপর ব্যাপক নেতৃত্বাচক প্রভাব পড়ে।

বিএনপি-জামায়াতের অগ্নিসন্ত্বাস: কয়েকজন নেতার তত্ত্বাবধানে ঢাকাজুড়ে চালানো হয় হত্যাযজ্ঞ ও নাশকতা



২০১৩ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত কয়েকধাপে যে নাশকতা চালানো হয়েছে দেশব্যাপী, তা কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনা করেছে বিএনপি-জামায়াতের শীর্ষ নেতারা। এরপর এলাকাভিত্তিক নির্দিষ্ট নেতাদের অর্থায়ন ও পৃষ্ঠপোষকতায় চলন্ত ঘানবাহনে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ, জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা, মানুষের ঘর-বাড়িতে আগসংযোগের মাধ্যমে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালায় তারা। ঢাকাতে কয়েকজন সাবেক ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ছাত্রদল ও শিবির নেতা, এবং সাবেক এমপির পরিবারের মাধ্যমে নাশকতার নীলনকশা বাস্তবায়ন করে বিএনপি-জামায়াত চক্র।

২০১৫ সালের ২১ জানুয়ারি প্রথম আলো পত্রিকার অনুসন্ধানী সংবাদে এসব তথ্য উঠে আসে। জানা যায়, রাজধানীজুড়ে নাশকতার জন্য ৪৫ থেকে ৫০ জনের একটি দলকে শনাক্ত করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এই নাশকতাকারীদের সমষ্টি করে ১২ জন সাবেক ওয়ার্ড কাউন্সিলর। বিএনপি নেতা কফিলউদ্দীন ও সাবেক এমপি এস এ খালেকের ছেলে সাজুসহ কয়েকজন নাশকতার জন্য অর্থ দিয়েছে। আর সিটি করপোরেশনের সাবেক কাউন্সিলরদের মধ্যে বাড়তার কাইয়ুম, মিরপুরের হাসান, রাজাবাজারের আনোয়ার, শেখেরটেকের মনির, মগবাজারের মজিদ, ওয়ারীর আবুল, লালবাগের কালা খোকনরা নাশকতাকারীদের আশ্রয়প্রশ্রয় দেয়।

২০ জানুয়ারি সন্ধ্যায় ঢাকার টেকনিক্যাল মোড়ে বাসে আগুন দেওয়ার সময় আঙুর নামে একজনকে হাতেনাতে ধরে পুলিশে দেয় জনগণ। এরপর আঙুর জানায়, তারা তিনজন টাকার বিনিময়ে বাসে আগুন দিতে হেমায়েতপুর থেকে ঢাকায় এসেছে। নাশকতাকারীদের একটি বড় অংশকে নিয়ন্ত্রণ করতো ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি ইসাহাক সরকার। ২০১৩ থেকে ২০১৫ এর শুরু পর্যন্ত নাশকতার সময় আটক ১২ জন ব্যক্তি তাদের প্রশংসনাত্মক হিসেবে ইসাহাক সরকারের নাম বলেছে ডিবিকে। ২০১৩ সালের ২৮ নভেম্বর শাহবাগে বিহঙ্গ পরিবহনের বাসে অগ্নি সংযোগ করে ৮ জনকে হত্যার ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ওই তিনজনই ইসাহাক সরকারের নাম বলেছে পুলিশকে।

জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীরাও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুসারে নাশকতা করেছে। ২০১৫ সালের ১৭ জানুয়ারি মতিঝিলে ককটেল বিহুরণ ও আগুন দেওয়ার সময় দুজনকে ধরে পিটুনি দিয়ে পুলিশে দেয় জনগণ। আটক দুজন ওমর ফারুক ও মো. মামুন শিবিরের সদস্য। মামুন এর আগেও নাশকতার দায়ে গ্রেফতার হয়েছিল। আর ওমর ফারুকের ভাই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে জামায়াত নেতাদের আইনজীবী।

বিএনপি জামাতের অগ্নিসন্তাস: দগদগে ক্ষত নিয়ে বেঁচে থাকাদের আর্তনাদ



তীব্র মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে আছেন ২০১৩-১৫ সালে বিএনপি-জামায়াতের আন্দোলনের সময় নিহতদের স্বজন এবং অগ্নিদণ্ড আহতরা। শরীরে ও মনে দগদগে ক্ষত নিয়ে বেঁচে থাকা সেই মানুষগুলোর আর্তনাদে এখনো ভারী হয় বাতাস।

বিএনপি-জামায়াতের সেই আন্দোলনের সময় কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে একটি চলন্ত বাসে হামলা করে অগ্নিসন্তাসীরা। সমুদ্র সৈকত ঘুরে স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে সেই বাসে কল্পবাজার ফিরছিলেন নুরজামান বাবলু। বাসে অগ্নিদণ্ড হয়ে মারা যান নুরজামান বাবলু, তার কিশোরী কন্যা মাইশা। গুরুতর হয়ে আহত হয়ে প্রাণে বেঁচে যান নুরজামানের স্ত্রী মাফুয়া বেগম। আজো তার শরীরে অগ্নি দহনের জ্বালা, মনে চোখের সামনে স্বামী-সন্তানকে আগুণে পুড়ে মারা যেতে দেখার দগদগে ক্ষত, চোখে অবিরাম কান্দা। এক বুক দীর্ঘশাস আর আর্তনাদ নিয়ে বেঁচে আছেন মাফুয়া বেগম।

রোববার (০৬ নভেম্বর) রাজধানীর জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে আওয়ামী লীগ আয়োজিত ‘অগ্নি সন্তাসের আর্তনাদ: বিএনপি-জামাতের অগ্নি সন্তাস, নৈরাজ্য ও মানবাধিকার লজ্যনের খন্ডচিত্র’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে নির্দারণ কষ্ট নিয়ে বেচে থাকার সেই দুঃসহ কষ্টের কথা তুলে ধরেন মাফুয়া বেগমসহ অগ্নিসন্তাসে কয়েকজন নিহতের স্বজন এবং দণ্ড হয়ে বেচে থাকা কয়েকজন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। এতে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন দেশের কুটনৈতিকরা উপস্থিত ছিলেন।

কাঁদতে কাঁদতে মাফুয়া বেগম বলেন, ‘আমরা রাজনীতি করি না, আমরা রাজনীতি বুঝি না। পেটের দায়ে আমাদের স্বামী সন্তানদের রাস্তায় বেরতে হয়। কেন আমরা এভাবে অগ্নি সন্তাসের শিকার হবো। আমার সন্তান মাইশা কি অপরাধ করেছিল। আমার স্বামী কি অপরাধ করেছিল। আমি আমার সন্তানের ডাক আট বছর থেকে শুনতে পাই না। মাইশা আমাকে আর মা বলে ডাকে না।’

সেদিন প্রাণে বেঁচে যাওয়া এবং চোখের সামনে স্বামী-সন্তানকে আগুণে পুড়ে মারা যেতে দেখার দুঃসহ স্মৃতির কথা তুলে ধরে মাঝুয়া বলেন, ‘প্রাণে বাঁচাতে আমার স্বামী আমাকে জানালা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল। আমি আমার সন্তানকে বাঁচাতে পারিনি, স্বামীকে বাঁচাতে পারিনি। চোখের সামনে দাউ দাউ করে আগুণ জ্বলেছে, আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি। এখনো আমার বুকের মধ্যে দাউ দাউ করে সেই আগুণ জ্বলে।’

‘আমি এখনো সারারাত ঘুমাতে পারি না। আমার চোখের সামনে সেই আগুণের শিখা দেখতে পাই। আমার মাইশা আস্মু বলে যে চিৎকার দিয়েছিল সেই ডাক এখনো আমার কানে বাজে। আমি ঘুমাতে পারি না। সারারাত আমি ঘুমাতে পারি না। আমরা কি অপরাধ করেছিলাম?’ মাঝুয়া বেগমের আতনাদে ভারী হয়ে ওঠে জাতীয় জাদুঘরের মিলতায়ন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ অনেককে অশ্রুসজল হতে দেখা যায়।

মাঝুয়া বেগমের মতো এই অনুষ্ঠানে স্বজন হারানোর বেদনা কিংবা শরীরে পোড়া ক্ষত নিয়ে নিদারণ কষ্টে বেচা থাকা আরও কয়েকজন তাদের দুঃসহ যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেন। এছাড়া বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সময় সামরিক বাহিনীতে নিহতদের কয়েকজন স্বজন তাদের বেদনার কথা তুলে ধরেন।

ককটেল হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত চোখ নিয়ে বেঁচে থাকা শিক্ষার্থী অন্ত বড়য়া বলেন, ‘আমরা শিশুরা কি অপরাধ করেছিলাম। আমরা কেন রাজনৈতিক সহিংসতার শিকার। পেট্রোল বোমা-ককটেল মেরে এটা কি ধরনের রাজনীতি। আমরা একটা সুষ্ঠু সুন্দর দেশ চাই। সুষ্ঠু সুন্দর দেশের স্বপ্ন দেখি।’

স্বামী হারা বীনা সলতানা বলেন, আমার সন্তানরা তাদের বাবাকে ডাকতে পারে না। কি অপরাধ করেছিল আমার স্বামী। সহিংসতায় জড়িতদের দৰ্শনমূলক শাস্তি চাই। নিহত পুলিশ সদস্য বাবলু মিয়ার স্ত্রী বলেন, আমি স্বামী হারিয়েছি, আমার সন্তান বাবা হারিয়েছে। আর কেউ যেন স্বামী হারা-সন্তান হারা না হয়।

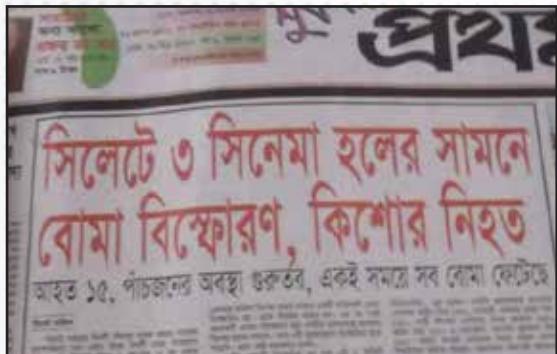
শাহবাগে বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় নিহত নাহিদের মা রূণি বেগম বলেন, আমার সন্তানের লাশ আমি দেখতে পারিনি। আমার সন্তান হত্যার বিচার চাই। আপনি (প্রধানমন্ত্রী) আমার মা, আমার সন্তান হত্যার বিচার চাই। যাত্রাবাড়িতে বাসে পেট্রোল বোমা হামলায় গুরুতর আহত হন সালাউদ্দিন ভূইয়া। শরীরের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে ঝলসে যায় পুরো মুখ। আগুণে পুড়ে পুরো চেহারা বিকৃত হয়ে যায়।

সালাউদ্দিন ভূইয়া আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, আগে আমার চেহারা দেখতে সুন্দর ছিল। এখন আমাকে দেখে মানুষ ভয় পায়। আমার পাশে সিটে মানুষ ভয়ে বসতে চায় না। কেউ কাজে নেয় না। আগে যেখানে যেতাম চাকুরী হয়ে যেতো।

নিজের চোখের সামনে আগুণে পুড়ে মারা যায় কার্ভার্ড ভ্যান চালক রমজান আলীর সন্তান মনির হোসেন। রমজান আলী বলেন, আমার ছেলে কি অপরাধ। আমরা তো কোন রাজনীতি করি না। আমরা খেঁটে খাওয়া মানুষ। পেটের দায়ে, এক মুঠো ভাতের জন্য টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া গাড়ি চালাই। কি অপরাধে আমার সন্তানকে পেট্রোল বোমা মেরে হত্যা করা হলো। তিনি তার সন্তানের হত্যাকারীদের কঠোর শাস্তি দাবি করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ছোট একটি নাটিকার মাধ্যমে অগ্নিদন্তদের যন্ত্রণা চিত্র তুলে ধরা হয়, এরপর বিএনপি-জামায়াতের আন্দোলনের সময় নিহত ও আহত অগ্নিদন্তদের ওপর এবং যানবাহনের অগ্নিসংযোগের ঘটনা নিয়ে একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়।





বিএনপি-জামায়াত আমলে সংখ্যালঘু ও
আওয়ামী লীগ কর্মীদের ওপর নৃশংস নির্যাতনের
**৪০৯২টি ঘটনা জানতে
কোড স্ক্যান করুন**



www.albd.org